সুরা হামদের আধ্যাত্মিক তফসির

জেনে রাখ! মারেফতি মানুষেরা প্রতিটি সুরার বিসমিলাহ্কে ঐ সুরার সাথে সম্পর্কযুক্ত অবিচ্ছদ্য অংশ বিশেষ বলে বিশ্বাস করেন । এ কারণেই প্রতিটি সুরার বিসমিলাহ্ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে । এমন কি প্রতিটি ব্যক্তির বিভিন্ন কর্মে ও কথায় উচ্চারিত বিসমিলাহও একে অপরের সাথে পার্থক্য রয়েছে । এ বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল, বস্তুগত সিলসিলা যা সমগ্র বাস্তবতার নিলয় 'গয়াতুল কুসওয়া' (غاية القصواى) এর প্রজ্ঞার পবিত্র আধার থেকে অস্তিত্বগত সীমান্তের সর্বশেষ সীমানা, সৃষ্টির সারিবদ্ধ (হাইউলা বা বস্তুর প্রাথমিক অবস্থার ভুবন) ও প্রকৃতি সবই হযরত মহান নাম আলাহ্ (الله) এর বর্হিপ্রকাশ। এ সব কিছুই তাঁর অনুগ্রহ ও পূর্ণ ইচ্ছার তাজালির প্রকাশ যা কর্মবাচক নামের জনক। যেমনটি বলা হয়েছে।

ظهر الوجود ببسم الله الرحمن الرحيم অর্থাৎ সমগ্র অস্তিত্ব বিসমিলাহর দ্বারা উৎপত্তি ঘটেছে। এ অর্থটি (بسمله) ক্ষেত্রে মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী তার আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়া নামক গ্রন্থের ২খন্ড ১৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় উলেখ করেছেন ।

অতএব বর্হিপ্রকাশের বহুত্বে এবং বিভিন্ন রুপের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব নাম হল, ঐ কর্ম বা ভাষ্যের প্রকাশ স্বরুপ যার উপর ভিত্তি করে উদ্ভূত সে হয়েছে। আলাহ্র পথের পথিকরা তাদের যাত্রার প্রথম ধাপে অন্তরকে বোঝাবে যে, প্রকাশিত সকল রুপই 'বিসমিলাহ' । বরং সবই আলাহ্র নাম বিশেষ । প্রতিটি নামের পরিধি ও সংকীর্ণতা ও পরিব্যাপ্ততা সবই তাদের প্রকাশের অনুরুপ। আধার এমন একটি দপর্ণ বিশেষ যেখানে নাম সমুহ প্রকাশিত হয়েছে । আলাহ্র নাম সমুহ যদিও মুলতঃ প্রকাশে প্রাস্তিক বাস্তবতা এবং প্রকাশের ভিত্তি ও মেরুদন্ড স্বরুপ । তবুও রুপের ক্ষেত্রে, প্রকাশের দিক থেকে এর পশ্চাত্যে অবস্থান করছে । যেভাবে সে আপন স্থানে নিবদ্ধ ।

এভাবে পথিক যখন বিভিন্ন আকার ও রুপের সীমানা অতিক্রম করে 'তাউহীদে ফেইলী-তে' (توحيد فعلى) উত্তীর্ণ হবেন । তখন তার নিকট সমগ্র আকার, ভাষ্য, কার্য একক 'বিসমিলাহ' এর এবং সমস্ত অর্থ এক অভিন্ন সমন্নয়ে পরিণত হবে ।

প্রথম ধারণা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের কোন সুরা বা সুরা হামদের বিসমিলাহর (بسمله) (মত [তাজালি] পরিব্যপ্ততা, ও সামগ্রিকতা মুলক কোন নামই নেই। যেভাবে প্রশিদ্ধ হাদীস (অভিভাবকদের অভিভাবক এর উক্তি) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে । কেননা তার সংশিষ্ট বিষয় বস্তু অন্য সকল সংশিষ্ট বস্তু থেকে পরিব্যপ্ততর । যেমনটি শুদ্ধ সাধকেরা বলে থাকেন, আল হামদ্ অদৃশ্য ভুবনের প্রতি ইঙ্গেত করে যে ভুবন বিশুদ্ধ প্রসংশা ও আলাহ্র গুণকীর্তনকারী । তাদের প্রসংশা ভাষ্যই তাদের সাত্মিক ভাষ্য ।

আর (ربٌ العالمين)রাব্বুল আলামীন প্রকৃতির দপর্ণে আলাহ্র নাম প্রকাশের প্রতি নির্দেশ করে যে নাম সকল তার প্রতিপালকীয় অবস্থানের যথাপোযুক্তও এবং যে (প্রতিপালক) অস্তিত্বকে অপূর্ণত্ব থেকে পূর্ণত্বে পৃথিবীর প্রকাশিত স্থর থেকে অদৃশ্য ভুবনে যাত্রার পথনির্দেশনা [যা প্রকাশিত বিশ্বের সত্তা স্বরুপ] ও উপযুক্ত প্রতিপালন করেন । (رحمانيّت) রাহমানিয়াত (رحيميّت)রাহিমিয়াত প্রতিপালকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । আর 'মালিকিয়াউমিদ্দীন' مالك يوم الدين দ্বারা সামগ্রিক প্রত্যবর্তন ও বৃহত্তর কেয়ামতের প্রতি ইঙ্গেত করা হয়েছে ।

যখন সাধকের অন্তরে অনন্তের প্রভাত উন্মেষ ঘটবে এবং মহান একক সত্তার নুরে উদ্ভাসিত হয়ে কেয়াকমতের সূর্যালোকে জ্যোর্তিময় হয়ে উঠবে ।তখন পথিক সামগ্রিক উপস্থিতির (حضور) ধারক হবেন । সে-ই পবিত্র অবস্থান ও অনুরাগের জলসা থেকে (محفل انس)উপস্থিত সম্মোধনে "এক মাত্র আপনাকেই উপাসনা করি এবং সাহার্য প্রার্থনা করি " বলতে শিখবে এরপর যখন সে মহান একক সত্তার আসক্তি, আর্কষন ও অনুরাগের অবস্থান থেকে আপনায় প্রত্যার্বতন করবে । তখন বিনাশের পর স্থায়ীত্ব (সাউহ বাদাল মাউহ্) লাভ করবে । এ পর্যায়ে সে আপন হেদায়েতের ক্ষেত্রে প্রভুর প্রতি যাত্রায় সহযাত্রীদের প্রতি আহ্বান করবে ।

অতএব সুরা হামদ্ জ্ঞানগত, সত্তাগত, যাত্রাগত, নিরাকার, আকার উপদেশ ও হেদায়েতগত অস্তিত্বের সমস্ত সিলসিলার ধারক। এসব কিছুর প্রকাশের নাম, সমস্ত ইচ্ছা শক্তির সমষ্টিই মহান নাম (الله) আলাহ্ । তাই তিনিই 'মিফতাহুল কিতাব' গ্রন্থের চাবিকাঠি, তাই পরিশেষেও তিনি, শুরুতে এবং সমাপ্তেও তিনি । আলাহ্ নাম সব কিছুর প্রকাশিত, অপ্রকাশিত রুপ এবং শুরু ও সমাপ্তও আলাহ্ নাম । আলাহ্ আসমান ও জমিন সমুহের জ্যোর্তি (নুর) الله نور السموات والارض – সুরা নুর ৩৫ নম্বর আয়াত ।

প্রভু অনুরাগী শুদ্ধ সাধকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ সুরার তফসির হল , মহান নাম ' আলাহ্'র প্রকাশ যা সার্বিক ইচ্ছা শক্তির সমষ্টি । আর মহান নাম 'ইলাহী' রাহমানিয়াত ইচ্ছার অবস্থানের অধিকারী, যা সমগ্র অস্তিত্বের বিস্তৃতিসম । আবার রাহিমিয়া ইচ্ছা অস্তিত্বের পূর্ণতায় যাত্রার পাথেয় দানকারী ।

সমগ্র বিশ্বভ্রমন্ডও গুণমুলক (অদৃশ্যের প্রথম হযরত আকার থেকে অস্তিত্বের শেষ সীমানা, রুপক বিশ্ব, ও প্রথম বারযাখ পর্যন্ত) গুণবাচক প্রধান আলাহ্ । অর্থাৎ সামগ্রিক নামের সমষ্টি আলাহ্র অবস্থান প্রতিষ্ঠায়, কেবল তাঁরই জন্যে । প্রতিপালকের ও বিশ্ব ভ্রমন্ডের লালন পালনের অবস্থান বা মর্যাদা । যে অবস্থান বর্হিপ্রকাশ হল প্রকৃতিও এ প্রতিপালকের অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে, রাহমানিয়াত ও রাহিমিয়াতের দ্বারা ,যা রাহমানিয়াতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ (فيض) সঞ্চারণ করা হয় । আর 'হাইউলা' (هيولي সত্তার প্রাথমিক অবস্থা) রাহিমিয়াত প্রকাশের মাধ্যমে সৃষ্টিকে প্রতিপালিত করে তার যথার্থ স্থানে পৌছে দিয়ে থাকে । আর (مالك يوم الدين) 'মালেকিইয়াউমিদ্দীন' যে সমস্ত অণু-পরামণুর আধিপত্যে অস্তিত্বকে সৃষ্টির বন্ধনে সংকুচীত ও অদৃশ্য অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করাবেন ।

যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়ে ছিল পুনরায় সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করাবেন।

تعودون كمابدءكم -সুরা আরাফ ২৯ নম্বর আয়াত ।

আর এটাই হল অস্তিতের পূর্ণ বন্ধনী। যা 'বিসমিলাহির রহমানির রাহিম' (بسم الله الرحمن الرحيم) এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে । আর সুরা হামদে [কিছুটা] বিস্তারিত ভাবে । ..(مالك يوم الدين) 'মালেকিইয়াউমিদ্দীন' বিশুদ্ধ আধিপত্য একমাত্র পরম সত্যের জন্যেই , যেমনটি আমরা হাদীসে দেখতে পাই ।

–বিহার আল্ আনওয়ার ৮৯খন্ড ২২৬পৃঃ। কিতাব আল্ কুরআন অধ্যায় ৩ নম্বর হাদীস। মুহাজ্জাতুল বেইজা ১ম খন্ড ৩৮৮ পৃঃ।

যখন আলাহ্র প্রতি যাত্রায় পথিক 'মেকত'إقرأوارق[1] [পড় এবং উপরে আরহন কর] ও মিরাজে উত্তীর্ণ হয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে এবং পরম সত্যের বাস্ত

বতায় বিনাশ প্রাপ্ত হবে তখনই পরম সত্য তার প্রতি বিকশিত হয়ে একক সত্তায় [নুরে] প্রকাশিত হবে । তখন সে ঐ সত্তার ভায়ায় বলবে- إياك نعبد و إياك نستعين একমাত্র আপনাকেই উপাসনা করি এবং একমাত্র আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

পূর্ণ মানব সত্তার নুর যেহেতু সকল অপূর্ণ নুরকে পরিবৃত্ত করে রেখেছে, এবং তার লক্ষ্য ও উপাসনা, অনন্ত আলায়য়ের প্রতি নিবিষ্টতা তাই ক্রিয়া গুলো বহুবচনে উচ্চারণ করবে ।

سبحنا فسبحت الملائكةا و قىسنا فقدست الملائكة و لو لانا ما سبحت الملائكة....

আমরা প্রভুর গুণকীর্তণ করলাম অতঃপর ফেরেস্তাগণও গুণকীর্তন করল। আমরা প্রভুর পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছি , অতঃপর ফেরেস্তাগণও পবিত্রতার ঘোষণা দিল। আমরা যদি না থাকতাম তাহলে ফেরেস্তাগণও গুণর্কীতন করত না ।

– আইউনু-এ আখবরে রেজা ১খন্ড ২৬২ পৃঃ ২৬ অধ্যায় ২২ নম্বর হাদীস। বিহার আল্ আনওয়ার ২৫খন্ড ১নম্বর পৃঃ। কিতাব আল্ ইমামাহ্ প্রথম অধ্যায়ের হাদীস (তাদের সৃষ্টি, মৃর্ত্তিকায় আবৃত, ও রুহ্ প্রদানের অধ্যায়) ।

অতঃপর পথিক যখন তার 'আমি বা আমিত্ব' নিজেকে সম্পূর্ণ রুপে নিঃস্বার্থ ভাবে মহান পবিত্র সত্তার প্রতি উৎস্বর্গ করল এবং সত্য ব্যতীত তার সমস্ত কিছুই নির্মূল করল তখনই অদৃশ্য একক সত্তার অনন্ত অনুগ্রহ ও পবিত্র করুণাধারা তার প্রতি উন্মোচিত হবে । সে পরম সত্যের প্রতিবিম্বে সজ্ঞেয় হয়ে উঠবে, এবং হাক্কানী অস্তিত্বে আপন ভূবনে প্রত্যাবর্তণ করবে। সে যখন বহুত্বের সম্মুখীন হবে তখন বিচ্ছেদ ও কপটতার ভয়ে উৎকন্ঠিত থাকবে এবং আপন হেদায়েত যা (কেননা অন্য সকল অস্তিত্ব পবিত্র পূর্ণ মানব বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ও পত্রসম) সার্বিক হেদায়েতসম মানুষকে ঐ সরল ও সোজা পথে আহ্বান করবে (সার্বিক নামের প্রতি যাত্রা ও হযরত মহান الله اسم اعظمনাম আলাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবতর্ন)। এ যাত্রায় মাত্রাতিরুক্ততা বা সীমালংঘন (عليهم مغضوب) ও (ضالين) মুক্ত পথ কামনা করবে । অথবা বারযাখী হেদায়েত যা বহুত্বে একত্বের মিলন ও একত্বে বহুত্বের মিলন মুক্ত অবস্থান। যাদের মধ্যস্থানে একত্ব ও প্রতিবন্ধক স্বরুপ বহুত্বের আবারনের স্থান যা হল (مغضوب عليهم) এবং বহুত্বের প্রতিবন্ধক স্বরুপ আবারণ একত্বের পথে যা (ضالين) এর অবস্থান প্রভুর ঐশর্যে বিক্রিত যুক্ত পথের প্রার্থনা করবে।

معنى قول القائل بسم الله اى أسم على نفسى سمة من سمات الله و هى العباده قال الاراوى فقلت له ماالسمة ؟ قال العلامة

তাওহীদ গ্রন্থে ইমাম রেজা (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমামকে (بسمله) বা (بسم الله) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল তিনি বলেন ঃ এর অর্থ হল (يسم الله) পাঠকারী বলবে, আমি আমার উপর মহান প্রভুর নামসমূহের একটি নাম অর্পন করলাম আর তা হল ইবাদত। বর্ণনাকারী বলেন অতপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নাম অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ নিশানা বা প্রতীক ।

– আত্ তাওহীদ ২২৯ পৃঃ ৩১ অধ্যায় হাদীস নম্বর এক । মাআনী আল আখবর ৩ নম্বর পৃষ্ঠা ।

উলেখিত পবিত্র হাদীস থেকে এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পথিককে অবশ্যই উপাসনায় মহান নাম ' আলাহ্'র স্থরে উপনীত হতে হবে। বিশুদ্ধ উপাসনার অবস্থানে উপনীত হওয়ার পথ হল হযরত প্রতিপালকে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া। কেননা যতক্ষণ পথিক আমি বা আমিত্বের আবারণে পরিবৃত ততক্ষণ পর্যন্ত উপাসনার পরিচ্ছদ পরিধানে সক্ষম হবে না। বরং সে আমিত্ববাদী, আত্ম পুজারী, আর তার উপাস্য হল তারই কামনাবৃত্তি।

أرأيت من اتخذَ إلٰه هواه তোমরা কি তাদের দেখেছো যারা তাদের প্রবৃত্তিকে খোদা স্বরুপ গ্রহণ করেছে ? – সুরা ফুরকান ৪৩ নম্বর আয়াত ।

যার দৃষ্টান্ত হল অভিশপ্ত ইবলিস যে আমিত্বের আবারণে হযরত আদম (আঃ) কে প্রত্যক্ষ করে তার উপর নিজের প্রাধান্যদাবী করে ছিল ।

خلقتني من نار و خلقته من طين আমাকে আগুন এবং তাকে কাঁদা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছে । – সুরা আরাফ ১২ নম্বর আয়াত ।

বলল তখন সে ঐ পবিত্র ঐশী সান্নিধ্যের দরগা থেকে বিতাড়িত হল । তাই বলা হয় ঃ কেউ যদি 'বিসমিলাহ্' দ্বারা আপন সত্তাকে (الله سمة) ঐশী গুণে গুণান্বিত বা (الله علامة) ঐশী বৈশিষ্ট্যে শোসভিত করে ও সে নিজের নামের অবস্থানে উপনীত হয়ে থাকে তাহলে তখন তার দৃষ্টি হযরত আদম (আঃ) এর মত হবে । যে ভাবে আদম (আঃ) প্রকাশিত বিশ্বকে (তিনি নিজেও এ বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত রুপ) আলাহ্ নাম স্বরুপই পরিদর্শণ করেছেন ।

و علم ادم الأسماءَ كلها– এবং আদমকে সমস্ত নাম সমুহ শিক্ষা দিয়েছি ।– সুরা বাকারা ৩১ নম্বর আয়াত ।

এ অবস্থায় তার নামায়ন বাস্তব ও সত্য নামায়নে পরিণত হবে। আর এ অবস্থান উপাসনার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে । মহান প্রভুর পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ অন্য সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি ও আমিত্ব, আত্ম প্রীতির বন্ধন মুক্ত করে দেয় । হযরত ইমাম সাদেক (আঃ) রেজাম নামক হাদীসে বলেন ঃ

يقطع علائقَ الإهتمام بغَيرِ من له قصِي و إلَيه وَ فَىَ وَ منه استرفَى

যে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপণীত হতে তুমি যাত্রা শুরু করেছ, তার সাহায্য প্রার্থনা করে, অন্য সকল টান বা বন্ধনকে মুক্ত করেছ।– ফালাহু আল্ সায়েল, – ২৫পৃঃ ।

তাই পথিক যখন নামের অবস্থান অর্জনে সক্ষম হবেন তখন সে আপনাকে প্রভুত্বে বিলীন দেখবে । প্রভুর উপাসনা এমন এক সত্তা যার মুল অন্তর হল প্রভুত্ব, প্রতিপালক স্বরুপ।

العبودية جوهرة كنهها البوبية– মিসবাহ্ আল্ শারীয়া ১০০তম অধ্যায়।

সুতরাং সে নিজেকে আলাহ্র নাম স্বরুপ (اسم الله ওعلامةالله) ও আলাহ্তে বিলীন রুপে প্রত্যক্ষ করবে শুধু তাই নয় বরং সৃষ্টি জগতের সমস্ত অস্তিত্বকেও ঐ রুপে দেখবে। সে যদি পূর্ণ (ولي كامل) প্রতিনিধি হয়ে থাকে তাহলে প্রভুর পূর্ণ নামের অমূর্ত প্রতীক স্বরুপ, পূর্ণ উপাসনায় উত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য সে লাভ করেছে তাই প্রভুর একান্ত প্রকৃত বান্দা সে (عبدالله)।

سبحان الذى أسرى بعبده তিনি অতিশয় পুতঃপবিত্র যে আপন বান্দাকে আরোহণ করিয়ে ছিলেন ।– সুরা আল এসরা এক নম্বর আয়াত ।

এ আয়াতে বান্দা (عبد) শব্দটি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি আমিত্ব ও আত্ম প্রীতির কালিমা মুক্ত সত্তা , বান্দেগী ও সাধনার মাধ্যমে অনুরাগীদের জলসা এবং পবিত্রতার গগণে ও প্রভুর সান্নিধ্য মি'রাজ গমনের মাধ্যমে নামাজের তাশাহুদে বান্দেগীতে সাক্ষ্য দেওয়ার পর রাসুলের প্রতি সাক্ষ্য দিতে হয়। কেননা , বান্দেগী হল রেসালাতে উত্তীর্ণের সিড়ি। তাই নামাজ, মুমিনদের মি,রাজ এবং নবুয়াতের মিরাজের দৃষ্টান্ত দিয়েই [যাত্রা] শুরু করা হয়ে থাকে । তারপর বিসমিলাহ্ –তে উত্তীর্ণের সকল আচ্ছাদন অপসারণই যা প্রকৃত বান্দেগীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ।

المطلَقة سبحان الذى أسرى بنبيه بمرقاة العبودية – তিনিই পবিত্রময় সত্তা যিনি তার নবীকে পূর্ণ বান্দেগীর সিড়ির মাধ্যমে আরোহন করিয়ে ছিলেন । তাকে বান্দেগীর যাত্রার মাধ্যমে এততত্বতার গগণের প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত করিয়ে ছিলেন । তাকে বস্তুগত বিশ্ব থেকে মালাকুত যাবারুত, ও লাহুতের উর্দ্ধে আরোহণ করালেন ।

অন্য সকল বান্দারা ঐ পবিত্র নুরের প্রতিবিম্বের ছায়ার প্রতিচ্ছায়া, আলাহ্ নাম সমূহের কোন একটি নামের মাধ্যমে আলাহ্ নামে উপনীত হতে পারেন যার মুল তত্ব হল বান্দেগী, যা মি'রাজের সান্নিধ্যে পৌছে দেয় ।

অতঃপর পথিক যখন অস্তিত্ব জগতের বন্ধনীকে আলাহ্ নাম স্বরুপ প্রত্যক্ষ করবে তখন সে তার যাত্রার ক্ষমতানুযায়ী ঐশী রহস্য ভান্ডারের দ্বার উন্মোচন করে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হবে। এ স্তরের মানবরা সমস্ত প্রসংশা ও সুন্দরকে এক মাত্র পরম সত্যের [পূর্ণ নামের অমূর্ত] বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণনা করবেন । এরই পাশাপাশি সে সৃষ্টি জগতের কোন অস্তিত্বের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য বা সুন্দরকেই অবলোকন করবে না । কেননা পরম সত্য ব্যতীত অন্য সৃষ্টির গুণ বা বৈশিষ্ট্য অবলোকনই প্রভুর নাম [বিশুদ্ধ ভাবে] দর্শণের অন্তরায়। তাই কেউ যদি সত্যসত্যিই 'বিসমিলাহ' পাঠ করে তবেই প্রকৃত আল্ হামদুলিলাহ্ পাঠে সক্ষম হবেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ সৃষ্টির আবারণে ইবলিসের মত [প্রভুর] নামের স্থানের অন্তরালে থাকে তাহলে সকল প্রসংশাকেও প্রভুর পরম সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তণ করায় সক্ষম হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে , আমিত্বের আবারণে আবদ্ধ ততক্ষণ বান্দেগী ও নামায়ন থেকে পরিবৃত থাকবে। তাই এ অবস্থান বঞ্চিত ব্যক্তিরা প্রকৃত প্রসংশাকারীর স্তরে উপণীত হবে পারবেন না।

আবার যদি বান্দেগীর পথ ও প্রকৃত নামায়নের মাধ্যমে (হামেদীয়াতের) অবস্থানে উপণীত হয় এবং সে 'হামেদীয়াতের' (حامديت) বৈশিষ্ট্যকে যদি পরম সত্যের জন্যে নির্ধারিত ও পরম সত্তাকেই একমাত্র 'হামিদ' ও 'মাহমুদ' স্বরুপ জানে । কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজকে 'হামিদ' ও প্রভুকে 'মাহমুদ' স্বরুপ পরিলক্ষণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরম সত্যের (প্রকৃত) 'হামিদ' হওয়ার যোগ্য নয়। বরং সে স্রষ্টা ও সৃষ্টির 'হামিদ', আর এদ্বয়ের 'হামিদ' অর্থ সে একমাত্র নিজেরই গুণকীর্তনকারী 'হামিদ', এখানে প্রভু ও তার 'হামিদের' মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। তাই যখন সে হামিদীয়াতের অবস্থানে উপনীত হবে, তখন বলবে أَنتَ كَما أَثنَيتَ على نَفسِكَ অর্থ ঃ তুমি অমনই যেভাবে নিজের প্রসংশা করেছো । মহা নবী (সঃ) এর সিজদার দোয়াতে বর্ণিত হয়েছে [أعوذبكَ منك . لا أحصى ثَناءً عَلَيك . أَنتَ كَما أَثنَيتَ على نَفسِكَ] তোমা থেকেই তোমার কাছে আশ্রায় প্রার্থনা করি . . .তোমার প্রসংশা ও গুণকীর্তন সংখ্যায় পরিগণনা করা সম্ভব নয় । তুমি যেভাবে নিজেকে প্রসংশা করেছো ঠিক তেমনই আছো ।

– ফুরু–ই ক্বাফী ৩য় খন্ড ৩২৪ নম্বর পৃঃ । সালাত গ্রন্থ 'আস্ সুজুদ ওয়াত্ তাসবিহ্ অধ্যায়' ১২ নম্বর হাদীস মিসবাহ্ আল্ মুত্তাহজিদ ৩০৮ নম্বর পৃঃ । মিসবাহ্ আশ্ শারিয়া পঞ্চম অধ্যায় । আওয়ালি আল্ লায়ালি ১ম খন্ড ৩৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা ২১ নম্বর হাদীস ।

যখন সে হামিদীয়াতের আবারণ মুক্ত হবে, যা স্বয়ং মাহমুদীয়াতেরই প্রমাণ নির্দশণ বা চিত্তন । তখনই বান্দেগীর পথিক এ অবস্থাও অর্জন করবে, باسمه الحمذ له منه الحمذ وَ له الحمذ তাঁর নামে, একমাত্র তাঁরই জন্য প্রসংশা যথার্থ, তাঁর হতে প্রসংশা এবং তাঁরই জন্য প্রসংশা ।

আর এটা হল সান্নিধ্য ও নাওয়াফিলের প্রতিফল যার প্রতি এ পবিত্র হাদীসে ইঙ্গেত করা হয়েছে فإذا احببته كنت سمعه وَ بصرهُ وَ لِسنه তাঁকে যেহেতু ভালবাসি তাই তাঁরই চক্ষু, কান ও জিহ্বা হব ।

– উসুল আল্ ক্বাফী ২খন্ড ৩৫২ পৃঃ (ঈমান ও কুফর গ্রন্থ) 'যে মুসলমানকে কষ্ট দেয় ও অবমাননা করে' অধ্যায় ৮ নম্বর হাদীস ।

رب العالمين রব্বুল আলামীন– যদি [عالمينবিশ্বভ্রমন্ড] সৃষ্টিকুল, নামের ধারক হয় যা, বাস্তব রুপ। তাহলে রুবুবিয়াত (প্রতিপালক), ইলাহীয়াত (প্রভুত্ব) এর ন্যায় সাত্বিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে । যেখানে আলাহ্ নাম সর্বমহান হবে । কেননা, বাস্তব রুপ সাত্বিক জ্যোর্তি একত্বতার স্থানে পূর্ণ নাম অনুসারে যা পবিত্র অনুগ্রহের (فيض) জ্যোর্তিতে আধাঁর পরিগ্রহ করে । আর তখনই জ্ঞানগত বিষয়ে আকার ধারণ করে ।

উলেখিত পবিত্র অবস্থান 'রুবুবিয়াত' এর অর্থ হল, 'ইলাহীয়াত' এর অবস্থানকে জ্যোর্তিময় করা , যার ফলে সমস্ত নাম বিশেষ বিশেষ আকার পরিগ্রহ করবে । এভাবে পূর্ণ মানব সত্তার রুপ প্রথম অধ্যায়ে অতঃপর অন্য সকল রুপ তারই প্রতিবিম্বের বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হবে। রাহিমিয়াত ও রাহমানিয়াত ঐ সকল সম্ভব্যময়ী সত্তাকে চরম অদৃশ্য থেকে পূর্ণ প্রকাশে বিকাশ ঘটায় ألا إلى الله تصير الأمور – সুরা শুরা ৫৩ নম্বর আয়াত ।

সুতরাং এ পথের চুড়ান্ত লক্ষ্য, গতির সমপ্তি, আগ্রহের পরিতৃপ্তি, অস্তিত্বের মুল উৎস ও সৃষ্টি জগতের প্রেমিকা , প্রেমিকদের প্রেমসম্পদ, আসক্ত অনুরাগীদের আকাঙ্খা মহিমামান অতি পবিত্র সত্তা । যদিও তারা সবাই তাদের এ কাংঙ্খিত সত্তার প্রতি আকৃষ্ট তবুও সে যদি নিজকে বান্দা, প্রেমিক, প্রত্যাশায়ী , অনুরাগী হিসেবেই পরিগণনা না করে তাহলে এটা তার সত্তার জন্যে এক মহা অন্তরায় স্বরুপ । এ অন্তরায়কে ঐশী পথের পথিকদেরকে অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে অপসরণ করতে হবে। কেননা, এ স্থরে উপণীত হওয়া ব্যতীত نعبد أياك পাঠের অধিকার তার নেই। অর্থৎ তোমাকে ব্যতীত অন্য কিছুই অনুসন্ধান করি না। এক মাত্র তোমাকে ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না । কেবল তোমাকেই গুণকীর্তন করি । সর্বক্ষেত্রে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাই না । আমরা বা সব কিছুই সৃষ্টির অস্তিত্বের ক্রমধারার অনু-পরামণু যার সর্বনিম্ন পর্যায় বস্তু থেকে সর্বোচ্চ স্তরের অদৃশ্য আকার । সবাই সত্যানুসন্ধানী, সত্যকাঙ্খী। প্রত্যেকেই তাদের সকল কামনাতেই কেবল তোমাকেই পেতে চায় এবং যে কোন প্রেম বিনিময়ে কেবল তোমাকেই ভালবাসে।

فِطرَتَ الله التى فَطَرَ الناسَ عليها সেটা মহান আলাহর ফিতরাত যার উপর ভিত্তি করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ।– সুরা রুম ৩০ নম্বর আয়াত ।

يسَبح لَه ما فى السموات وَ الأرض আসমান সমুহে ও ভূ–পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই (প্রভুর) গুণকীর্তন করছে । – সুরা হাশর ২২ নম্বর আয়াত ।

পথিক যখন এ স্থর দর্শণ বা অর্জনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হবেন এবং নিজকে আপন অস্তিত্বের সর্বাঙ্গে 'মালাকা' শক্তি থেকে অদৃশ্যের তলদেশ পর্যন্ত এবং অস্তিত্বের সকল সিলসিলাকে পরম সত্যের প্রেমিক ও অন্বেষী স্বরুপ অবলোকন করবে। একই সাথে সে এ প্রেমময় অনুরাগের সম্মুখে প্রেমের প্রকাশ ঘটাবে আর প্রার্থনা করবে সত্যে সান্নিধ্য ও সাহায্য এবং (সিরাতে মুস্তকীম) সরল পথে হেদায়াতের যে পথ মানুষের প্রতিপালকের পথ إن ربِّى على صِراطٍ مستَقيم নিশ্চয় আমার প্রভু সোজা পথে আছেন । – সুরা হুদ ৫৬ নম্বর আয়াত ।

এবং যে পথে (منعم علیهم) নেয়ামত দান করা হয়েছে। যে পথ পূর্ণ সত্তার নবীগণ সিদ্দীকীনদের পথ। যেখানে তারা প্রত্যাবর্তন করেছে অপরিবর্তনীয় রুপ থেকে আলাহ্ স্তরে এবং অবস্থানে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, না অন্য কোন সসীম নামের সাগরে)। না , অন্য কোন নামে যে নাম, সসীম, ত্রুটিপূর্ণ, বা অপূর্ণ ।

নিম্নের হাদীসটি রাসুল (সঃ) এর নামে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ

كانَ أخی موسی عینه الیمنی عمیاءَ وَ أخی عیسی عینه الیسری عمیاءَ وَ أنَا ذو العَینَین

আমার ভাই মুসার ডান চোখ ছিল অন্ধ, আর ভাই ঈসার বাম চোখ। আর আমি দ'ু চোখেরই (ধারক) অধিকারী ।

জনাব মুসার বহুত্ব একত্বের উপর প্রাধান্য পেয়েছিল আর জনাব ঈসার বহুত্বের উপর একত্ব প্রাধান্য লাভ করে ছিল । আর সর্বশেষ রাসুল (সঃ) এর অবস্থান ছিল বৃহৎ বারযাখী যা সীরাতে মুস্ত াকীমের মধ্যম স্থান ।

আলামীন (عالمین) শব্দকে মহামান্য আকার ধারণা করে এ পর্যন্ত সুরা হামদ্ এর তফসির করা হল । তবে আলামীন (عالمین) শব্দকে মহামান্য সাত্নিক নাম, গুণবাচক নাম কর্মবাচক নাম, অবস্তুগত বিশ্ব, বস্তু জগত অথবা বস্তু, অবস্তু দুটো অথবা সামগ্রিক সমষ্টিকেই যদি ধারণা করা হয় তাহলে সুরার তফসিরে পার্থক্য সৃষ্টি হবে ।

একই ভাবে যদি (اسم الله) পবিত্র এ আয়াতটিতে 'বিসমিলাহ্' আলাহ্ নাম (সার্বিক) ইচ্ছার অবস্থান ব্যতীত অন্য যে কোন অবস্থান ধরা হয় , তাহলেও সমস্ত সুরার তফসিরে পার্থক্য সৃষ্টি হবে। তাই সে অবস্থানকে সত্তাগত নাম, স্থায়ী আকার, উপস্থিত আকার, অদৃশ্য ভূবন, প্রকাশিত বিশ্ব, পূর্ণ মানব অথবা এ গুলো সার্বিক ভাবেও যদি ধরা হয় ।

আবার যদি আলাহ্ (الله) সাত্নিক প্রভুত্ব বা দৃশ্যিত ভুবনের প্রভুত্ব হয় এবং বিসমিলাহ্ এর রহমান ও রহিম যদি (اسم) এর গুণ অথবা আলাহ্র (الله) তাহলেও পবিত্র সুরার তফসিরে পার্থক্য দেখা যাবে ।

ঠিক একই ভাবে , বিসমিলাহ্' এর (باء) 'ব'-তে [استعنات و ملابست] সাহায্য ও সহযোগ অর্থ নিহীত থাকে অথবা (ظهر) এর সাথে (متعلق) সংশিলিষ্ট হয় বা স্বয়ং সুরার সাথে কিংবা সুরার যে কোন একটি অংশের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে তবুও তফসিরে পার্ধক্য দেখা দিবে । একই ভাবে পাঠের বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী, বহুত্বের আবারণে পতিত হওয়া, একত্বের প্রাধান্য বা বিনাশের পর স্থায়ীত্ব লাভ (المحو صحو بعد) অথবা অন্য যে সমস্ত অবস্থান পূর্বে উলেখ করা হয়েছে ধরা হলে , সুরা হামদ্ এর তফসিরের ধারা ভিন্ন রুপে করা উচিত । পবিত্র কুরআনে প্রকৃত তফসির ও উলেখিত অবস্থান সমুহকে লাভ করা যা প্রভুর ভাষ্য সমষ্টি তা এ লেখকের মত মানুষদের ক্ষমতা বর্হিভূত । إنما یعرِف القران من خوطبَ به পবিত্র কুরআন সে-ই যথার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম যাদের উদ্দেশ্য করে তার অবতরণ ঘটেছে। - বিহার আল্ আনওয়ার ৪৬ খন্ড ৩৪৯পৃঃ, তারিখে ইমাম মুহাম্মদ বাকের, ২০তম অধ্যায় ২ নম্বর হাদীস ।

এ পর্যন্ত উলেখিত তফসির ধারণার উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । و الله الهادی

('আদব আল সালাত' নামক গ্রন্থথেকে সংকলিত)

জেনে রাখ! যে ‘বিসমিলাহ’ এর ‘ব’ (باء) শব্দটির সংযোগ ক্ষেত্র নিয়ে আলেমদের মাঝে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। তবে প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও আধ্যাত্ম চর্চার পথ ও পন্থা অনুসারে বিশেষ বিশেষ সংযোগ সূত্রের উলেখ করেছেন । যেমন ব্যাকারণবিদগণ (ابتداء) শব্দটি অথবা (استعانت) উদহারণ স্বরুপ সংযোগের উজ্য লক্ষ্য বস্তু হিসেবে ধরেছেন। আবার বেশ কিছু হাদীসের আমরা দেখতে পাই- (أستعين بسم الله) মা’নী আল্ আখবর ‘ আলাহ’ অর্থের অধ্যায় ২ নম্বর হাদীস । আত্ তৌহিদ ২৩১ নম্বর পৃঃ ৩১ অধ্যায় ৫ নম্বর হাদীস ।

অথবা সর্বসাধারণের সন্তোষ মুলক কোন কিছু । অথবা অন্য সকল প্রচালিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে । তবে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের হাদীস

পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । এ (بسم الله) প্রসঙ্গে ইমাম রেজা (আঃ) বলেন ঃ

من سمات الله أى أسم على نفسى سمة معنى قول القائل بسم الله اى أسم على نفسى سمة من سمات الله و هى العباده

قال الاراوى فقلت له ماالسمة ؟ قال العلامة

তাওহীদ গ্রন্থে ইমাম রেজা (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমামকে (بسمله) বা (بسم الله) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল তিনি বলেন ঃ এর অর্থ হল (بسم الله) পাঠকারী বলবে, আমি আমার উপর মহান প্রভুর নাম সমূহের একটি নাম অর্পন করলাম আর তা হল ইবাদত । বর্ণনাকারী বলেন অতপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নাম অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ নিশানা বা প্রতীক ।

– আত্ তাওহীদ ২২৯ পৃঃ ৩১ অধ্যায় হাদীস নম্বর এক । মাআনী আল আখবর ৩ নম্বর পৃষ্ঠা ।

সর্বসাধারণরা (استعانت) শব্দ থেকে যে বিষয়টি উপলব্ধি বা উদ্ধার করেন, প্রকৃত অর্থ তার চেয়েও অনেক অনেক গভীর ও সুক্ষ্ম যার মধ্যে তৌহিদের রহস্য অতি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ভাবে লুকিয়ে আছে। আবার কোন কোন পরিশুদ্ধ সাধকেরা (ظهرَ) শব্দটিকে (باء) ‘ব’ এর উজ্য সংযোগ শব্দ স্বরুপ ধরে বলেনঃ ظهرَ الوجود ببسم الله সমগ্র অস্তিত্ব বিসমিলাহর দ্বারা উৎপত্তি ঘটেছে । এ অর্থটি (بسمله) ক্ষেত্রে মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী তার আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়া নামক গ্রন্থ ২ খন্ডের ১৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় উলেখ করেছেন ।

এটা শুদ্ধ সাধকদের পথ ও পন্থা অনুযায়ী ব্যাখ্যা। তারা সমস্ত অস্তিত্বকে বা সৃষ্টির সকল অণু–পরামণুকে এবং অদৃশ্য অথবা দৃশ্যিত ভুবনকে মহান প্রভু নামের সমষ্টি অর্থাৎ মহান নাম (اسم اعظم) ‘ আলাহ্ ’ এর জ্যোর্তির প্রকাশ স্বরুপ জানেন ।

সুতরাং নাম হল নিশানা ,প্রতীক, অথবা সুউচ্চ উন্নত অবস্থান, যা পরম সত্যের মুল ক্রিয়ার জ্যোর্তিময় প্রকাশ। যাকে (فيظ منبست) বা (اضافيه اشراقيه) বলা হয় । কেননা, এ পন্থানুযায়ী সমগ্র অস্তিত্ব জগত, সকার চিৎ শক্তি থেকে অস্তিত্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সবই একই অনুগ্রহের আকার এবং করুণার বর্ষন স্বরুপ। এ পথ ও পন্থার সত্যায়ানের পক্ষে অসংখ্য প্রভুর পবিত্র কুরআনের আয়াত ও নিস্পাপ মাসুম আহলে বাইত (আঃ) গণের হাদীস রয়েছে। উদহারণ স্বরুপ আল্ ক্বাফী গ্রন্থের একটি পবিত্র হাদীসে বলা হচ্ছে ঃ মহান প্রভু মাশিয়াত’ (مشيت) –কে অভিন্ন মাশিয়াতকেই অতঃপর অন্যকিছু উক্ত মাশিয়াতের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন । –উসুল আল্ ক্বাফী ১মখন্ড ১১০পৃঃ। কিতাবআল্ তৌহিদ।

প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পন্থা অনুযায়ী এ পবিত্র হাদীসটির { خلقَ اللهُ ؛ عبدِ الله (ع) قال عن ابى أَنَّها من صفات الارادة المشيئةَ بِنفسِها ثم خَلَقَ الاشياءَ بِالْمَشيَةِ . উসুল আল্ ক্বাফী ১খন্ড ১১০ পৃঃ ‘তৌহিদ গ্রন্থ’ الفعل ” অধ্যায় ৪ নম্বর হাদীস (১০৪১ হিঃ কামারী) } ব্যাখ্যা বিশেষণ করেছেন । তবে উলেখিত পন্থার ব্যাখ্যাই সর্বাধিক সুস্পষ্ট । আর তা হল মাশিয়াতের অর্থ – ক্রিয়াগত মাশিয়াত মশিয়্যত ফে'লিয়াযা অন্য ভাষায় (فيض منبست) এবং (اشياء) এর অর্থ হল, অস্তিত্বের ক্রমধারা বা ধারাবাহিকতা যা তাঁরই অনুগ্রহের আকার ও বর্ষন স্বরুপ । অতএব হাদীসের অর্থ হল মহান প্রভু ক্রিয়গত মাশিয়াত যা, সুপ্রাচীন সত্তাগত মাশিয়াতের প্রতিবিম্ব, তাকে সরাসরি কোন প্রকার মাধ্যম অবলম্বন ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব সমূহকে তাঁরই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি। সাইয়েদ মুহাক্কিক দমাদ (কুঃ) [১] গবেষণা ও সতর্কতার ক্ষেত্রে যিনি সুমান মর্যাদার অবস্থানের অধিকারী তিনি পবিত্র এ আয়াতটির অতি বিস্ময়কর [২] ব্যাখ্যা দিয়েছেন । একই ভাবে মরহুম ফেইজ[৩] (রঃ) এর উক্তিও [৪] ভিত্তি হীন নয় ।

মোটকথা নাম হল, اسم এমন এক ক্রিয়া শক্তির সত্তা যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র অস্তিত্ব জগত টিকে আছে। ঐশী ভাষ্যে সৃষ্টি জগতে (اسم) নামায়ান আহলে বাইতের ক্ষেত্রে অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমনটি আমরা দেখতে পাই (اسماء حسنى) – সর্বোৎকৃষ্ট নাম সমূহ আমরা [৫]। পবিত্র দোয়া সমূহে فلان وَ بِاسمكَ الذى تَجَليتَ على "তুমি যে নামে অমুকের উপর প্রকাশিত হয়েছো " [৬]এ জাতিয় ভাষ্যের বহু নির্দশণ রয়েছে ।

সম্ভবত প্রতিটি সুরার (‘বিসমিলাহ’ بسم الله) ঐ সুরার সাথেই সংশিষ্টি । উদাহরণ স্বরুপ সুরা ‘হামদ্’ এর বিসমিলিলাহ্ হামদের সাথেই সম্পর্ক যুক্ত বিষয় । এ জাতিয় ব্যাখ্যা এরফানী উপলব্ধি ও মারেফাতি মানবদের চিন্তাধারা সম্মত । কেননা, ঐ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, গুণকীর্তনকারীদের গুণকীর্তনও আলাহ্ নামের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত সুতরাং সমস্ত কর্ম ও কথার শুরুতে (নামায়ন) আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় [যা শরীয়তগত একটি মুস্তাহাব বিষয়] যে মানুষের যে কোন কথা ও কাজের উৎপত্তি শক্তির মুল প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হল প্রভু। কেননা, প্রতিটি স্বরুপ সত্তার সুক্ষ্ম কোষ সমূহও আলাহ্ নাম (اسم الله) এবং তাদের পরিভাষা অনুযায়ী সবই ‘ আলাহ্ ’ এর নাম বিশেষ । অতএব এ ধারণা অনুসারে বহুত্বের দৃষ্টিতে (بسم الله) এর অর্থ প্রতিটি কথা ও কার্য ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে । অন্য দিকে ফকিহ্গণ বলেন ঃ প্রতিটি পাঠের পূবে তার ‘বিসমিলাহ’ নির্ধারণ করা অত্যবাশ্যক । তাই যদি কোন সুরা পাঠের লক্ষ্যে ‘বিসমিলাহ’ পড়ে অন্য সুরা পাঠ করা হয় তাহলে বৈধ হবে না । – আল্ উরওয়াতুল উসকা ১খন্ড ৪৫৯ নম্বর পৃঃ ‘ কিতাব আস সালাত’ ২৩ অধ্যায় ‘ফিল কুররা’ ১১ নম্বর মাসআলা । মুসতামসাক -এ আল্ উরওয়াতুল উসকা ৬ খন্ড ১৮৩ নম্বর পৃঃ ।

তাই ফকিহদের পন্থাও উদ্দেশ্য বিহীন নয় । আর মহান নাম ‘ আলাহ্ ’ বহুত্ব নিপাতনের দেশ, এ দৃষ্টিতে সমস্ত ‘বিসমিলাহ’ এক অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে ।

অবশ্য এদু’শ্রেণীর দৃষ্টি ভঙ্গী অস্তিত্বের ধারাবাহিকতায় এবং অদৃশ ও সাদৃশ্য জগতে বিদ্যমান। বহুত্ব মুলক দৃষ্টিতে, বিভিন্ন রুপ দর্শনে অস্তিত্ব সমূহ অসংখ্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিশ্বের এ সকল রুপ ও আকার বিভিন্ন নাম, রাহমানীয়, রাহিমিয়া, কাহরীয়া, ও লুতফিয়ার জ্যোর্তির প্রকাশ। আর অপর দৃষ্টিতে পবিত্র ফেইজের অনন্ত নুরে বহুত্বের বিনাশে পুতঃপবিত্র জ্যোর্তি ও প্রভুর সামগ্রিক নাম

ব্যতীত অন্য কোন প্রতীক বা কিছুই উপস্থিত থাকে না । উলেখিত দৃষ্টি ভঙ্গীদ্বয় প্রভুর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।

প্রথম দৃষ্টিতেঃ হযরত একক সত্তা নাম ও গুণের বহুত্বের অবস্থানে এবং সামগ্রিক বহুত্ব সবই হযরতের। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিঃ সুমহান হযরত আলাহ্ নাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এদু'টি দৃষ্টি প্রাজ্ঞিক ও চিৎশক্তি সর্মথিত বিষয়।

তাই যখনই কেউ সুফী মনা হয়ে অন্তরের দ্বার উন্মোচিত করে অতেন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক যাত্রা ও সাধনায় নিমগ্ন হবেন। তখনই পরম ও সুমহান সত্যের তাজালিময় ক্রিয়া, নাম, সত্তা কখনও বহুত্বের অববয়ে আবার কখনও একত্বে ঐ শ্রেণীর সুফি-সাধকদের অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। এ জাতিয় তাজালির কথার প্রতি পবিত্র কুরআনে কখনও কখনও সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গেত করা হয়েছে। উদহারণ স্বরুপ মহান প্রভু বলেন ঃ

فلما تجلى رَبه للجبلَ جعَلَه دكاً وَ خَر موسى صعِقا– সুরা আরাফ ১৪৩ নম্বর আয়াত।

আবার কখনও হযরত রাসুলাহ্ (সঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর দর্শণের প্রতিও ইশারা করা হয়েছে, সুরা আনআম ও নাজম এর পবিত্র আয়াত সমূহে । শুধু তাই নয় নিষ্পাপ মাসুম ইমামদের প্রার্থনাতেও উক্ত বিষয়ের প্রতি অসংখ্য স্থানে নির্দেশ করা হয়েছে । বিশেষ করে সুমহান প্রার্থনা (سماب) সামাত' যার সনদ ও ভাষ্যের সত্যতা অস্বীকার করার মত প্রমাণাদি কারো নেই । যে দোয়াটি সর্বশ্রেণীর মানুষ (সুফী সাধক কিংবা সাধারণ জনগণ) সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয়। উলেখিত পবিত্র দোয়াতে অতি উচ্চ পর্যায়ের মর্মবাণী ও আধ্যাত্মিক পরিচিতির অমিয়সুধায় ভরপুর যার শিশির বিন্দু সুফি সাধকের অন্তরকে বিহ্বলিত করে দেয় এবং তার স্বর্ণাল ঐশী পথিকের জীবনে ফুকে দেয়। যেমনটি আমরা দেখতে পাই ঃ

وَ بنور وجهكَ الذى تجليتَ بِهِ للجَبَلِ فَجَعلته دَكا وَ خَر موسى صعِقا, وَ بِمجدكَ الذى ظهرَ على طورِ سيناءَ فَكلمتَ بِهِ عَبدَكَ وَ رَسولَكَ موسى بن عِمرانَ عَليهِ السلام , و بطَلَعَتِكَ فى ساعيرَ وَ ظُهُرِكَ فى جَبَلِ فاران

দোয়া সামাত ।-মিসবাহ্ আল্ মুতাহ্হাজ্জিদ - ৩৭৬ পৃঃ ।

মোট কথা নামায়ানের মুহুর্তে ঐশী পথিক অবশ্যই তার অন্তরকে এমন এক চেতনায় প্রজ্বলিত করে তুলবে যাদ্দারা সে প্রত্যক্ষ করবে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল অস্তিত্ব এবং অদৃশ্য ও দৃশ্য বিশ্ব ভ্রমন্ডসহ সবই 'আলাহ্' নামের অধীনে কেবল প্রতিপালিতই নয় বরং আলাহ্ নাম সমূহের প্রকাশের উপর ভিত্তি করেই প্রকাশিত। একই সাথে তার নিজের সকল প্রকারের গতি ও গতিশূণ্যতা সবই এবং বিশ্ব ভ্রমন্ড মহান নাম 'আলাহ্' এর উপর ভিত্তি করেই অস্তিত্বমান। অতঃএব পরম সত্যের প্রতি গুণকীর্তনকারী ও তার নিজস্ব উপাসনা, আনুগত্যতা, তৌহিদ, নিষ্ঠা সবই আলাহ্ নামের শক্তিতে দন্ডায়মান। তাই যখনই অনাবরত জিকির এর মাধ্যমে এ অবস্থান ও ঐশী অনুগ্রহ পথিকের অন্তরে গ্রথিত রুপে অবস্থান নিবে। যা উপাসনার চুড়ান্ত লক্ষ্য (যেমন ভাবে মহান প্রভু একান্ত অনুরাগের সুরে ও পবিত্র জলসায় আপনার ভাষ্যে (خلوت انس و محفل قدس) মুসা বিন ইমরানকে বলেন ঃ

إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبُدنى وَ أَقِمِ الصلوةَ لذكرى– সুরা ত্বাহা ১৪ নম্বর আয়াত ।

তিনি জিকিরকে নামাজ প্রতিষ্ঠার চুড়ান্ত লক্ষ্য স্বরুপ বর্ণনা করেছেন । তাই অনিবরত ও পরম জিকির' এর মাধ্যমে মারেফাতের অন্য পথ আরেফের অন্তরে প্রসারিত হবে এবং সে একচ্ছত্র বিশ্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার মন ও ভাষ্যের অবস্থা এমনই হবে যে أنتَ كما , أعوذبكَ مِنك أَثنيتَ على نَفسِكَ

الحَمدُلله باللهِ আলাহ্কে দিয়ে আলাহ্র প্রসংশা। হে প্রভু অমনই প্রসংশনীয় যেভাবে তুমি নিজকে প্রসংশা করেছ । তোমার থেকে তোমার নিকট আশ্রায় প্রার্থনা করি ।

এ পর্যন্ত বিসমিলাহর সাথে 'ব' এর সংশিষ্ট কিছু রহস্য এবং সামান্য কিছু 'মারেফাত' (সত্য পরিচিতি বিদ্যা) যা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব তার বর্ণনা করা হল। তবে 'ব' এর রহস্য ও 'ব' এর নিচের নোকতা যার অভ্যন্তরে আলী বংশীয় নিস্পাপ মাসুম ইমামদের কতৃত্ব (বেলায়াতে আলাভী) নিহীত রয়েছে এবং যেখানে কুরআনের সংক্ষিপ্ত রুপের সমষ্টি তা বর্ণনার জন্যে সুর্দীঘ সময়ের প্রয়োজন।

তবে অদৃশ্যের অদৃশ্য,অদৃশ্য অবস্থান ও রহস্যের রহস্য তার রহস্য এবং প্রকাশের প্রকাশ, প্রকাশ অবস্থানের পর হল নামের হকীকত। কেননা নাম হল সত্যের প্রতীক এবং পবিত্র সত্তায় বিলীন হওয়া। সুতরাং যখন কোন নাম, একত্বের গগণের নিকটতর ও বহুত্বের বিশ্ব থেকে দুরে অবস্থান করবে তখনই নামায়ানের ক্ষেত্রে সে পূর্ণতম। আর পরিপূর্ণতম নাম, এমন এক নাম যে সকল প্রকার বহুত্ব এমন কি জ্ঞানগত [বহুত্ব] থেকেও মুক্ত থাকবে। এ অবস্থান হল, হযরতের সত্তার অতিশয় পুতঃপবিত্র (فيض اقدش) স্তরের একক আহমাদী অদৃশ্যের তাজালি । পবিত্র এ فکا قابَ قوسينِ أوأدنى আয়াতটি হয়তবা এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গেত করছে।

'তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা তারও চেয়ে কম'

−সুরা নাজম, ৯নম্বর আয়াত।

পরবর্তী পর্যায়ে হযরত একক (আহাদীয়াত) হযরত মহান নাম 'আলাহ্' এর তাজালি। তার পর (فيض مقدس) −এ তাজালি । তারপর হযরত (حضرات اعيان) প্রত্যক্ষিত থেকে সর্বশেষ অস্তিত্বে, (এ গ্রন্থের রচয়িতা, 'রেসালে মিসবাহ্ আল্ হেদাইয়া' ৯ও 'শারহে দোয়ায়ে সাহর' ১০নামক গ্রন্থে উলেখিত সংক্ষিপ্ত বিষয় বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি।

আলাহ্ '(الله) প্রকাশের অবস্থানের হলেন (فيض مقدس) বিশুদ্ধ অনুগ্রহ। তবে আমরা যদি নাম বলতে অস্তিত্বগত আকার বুঝি তবুও (الله) নামন্তর, প্রকাশ ও প্রকাশিতের একতা এবং নাম নামিতে বিলীন হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে না। নিম্নের পবিত্র আয়াত দ্বারা الله نور السموات وَ الأَرض إلهٌ هُوالذى فى السماءِ إلهٌ وَ فِى ও الارضِ

−সুরা যখরুফ ৮৪ নম্বর আয়াত ।

এ অবস্থানের প্রতি নির্দেশ ও সাক্ষ্য বহন করছে। (واحديت) পরম একত্বতার অবস্থান হল সমস্ত নাম (اسم اعظم) মহান নামের অবস্থান আর যদি নাম বলতে (فيض مقدس) −এ তাজালির অবস্থানকে ধরা হয়। তাহলে এটিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য সম্ভবনা । আর সত্তাবাচক অবস্থান বা ফেইজে আকদাস فيض اقدس যদি মহান নামের লক্ষ হয়। তখন এ ধারণা অনুযায়ী (رحمن) ও (رحيم) এর অবস্থান পৃথক হবে যা স্পষ্ট বিষয়।

(رحمن) ও (رحيم) (اسم) এর গুণবাচক নাম হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আবার (الله) এর গুণবাচক নাম হওয়ারও সম্ভবনা আছে। তবে নামের গুণবাচক নাম হওয়াটাও যথাপোযুক্ত। কেননা, তারা আলাহ্ (الله) এর গুণের কীর্তন বা প্রসংশা করছে। অতএব (এধারণানুযায়ী) পূর্ণবৃত্তির সম্ভবনা মুক্ত হওয়া যাবে । যদি (الله) এর গুণবাচক নাম ধরেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব,পূর্ণবৃত্তিতে ব্যাকরণগত অলংকার বিদ্যমান। তবে নাম ধরলে প্রমাণ করতে হবে, (اسم) নামের লক্ষ্য হল, প্রকাশিত নাম

সমূহ। কেননা, অপ্রকাশিত নাম সমূহ ব্যতীত (رحمانيه) ও (رحيميه) বৈশিষ্ট্যের মত শোসভিত নাম নেই।

সুতরাং এখানে (اسم) বলতে সত্তাগত নাম হয় এবং সামগ্রিক অবস্থানে তার তাজালি হয়। (رحمانيه) ও (رحيميه) সত্তাগত গুণ হয় যার তাজালি (واحديت) একত্বতার অবস্থানে মহান নাম (اسم الله) 'আলাহ্ ' এর জন্য নির্ধারিত। আর কর্মবাচক

আর কর্মবাচক রহমত ও রাহমানিয়াত ও রাহিমিয়া তাদেরই প্রকাশ ও অবনমিত রুপ। আবার যদি নাম (اسم) বলতে কর্মবাচক সামগ্রিক তাজালি যা ইচ্ছা (مشيت) অবস্থান (رحمانيه) ও (رحيميه) কর্ম গুণবাচক নাম । তাহলে রামানিয় রহমত সমগ্র অস্তিত্বের জন্যে সার্বজনীন ভাবে প্রদত্ত অনুগ্রহ। তবে পরম সত্যের এটা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । কেননা, মহান সত্যের দাক্ষিণ্য অস্তিত্বের মুল ক্ষেত্রে কোন দ্বিশক্তির কোন প্রকার ভুমিকা নেই । একই ভাবে অন্য কোন অস্তিত্ব এ রহমত সৃজন অক্ষম । وَ الوُجوُد لا مؤثر فى إلاّ الله وَ لا إلهَ فى دارِ التحققِ إلاّ الله 'অস্তিত্ব প্রদানে আলাহ্ ব্যতীত অন্য কার কোন ভুমিকা নেই এবং অস্তিত্ব জগতে একমাত্র আলাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।'

ঐশী পথ নির্দেশকদের হেদায়তের পথও (رحيميه) রাহিমিয়ার রহমতের অমিয় সুধাসম তবুও এ করুণাধারা সফলকামী ও বিশুদ্ধ সত্তার فطرت عليّين অধিকারীদের জন্য নির্ধারিত। তবে এ বৈশিষ্ট্যটি একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য যা থেকে অন্য সকল সৃষ্টির ভাগ্যে পরিমানমত জুটে থাকে। আমরা পূর্বেও উলেখ করেছি যে, রাহিমিয়া'এর রহমত একটি সার্বজনীন রহমত। এ রহমত থেকে ব্যর্থকামীরা বঞ্চিত হওয়ার কারণ হল, তাদের অক্ষমতা, অপূর্ণতা, ও দুর্বলতা, না রহমতে কঠরতা, কার্পণতা। কেননা, হেদায়ত ও সত্য পথে আহবান সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে পরিধায্য। পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গত করা হয়েছে ঃ সুরা বাকারা – ১৮৫ নম্বর আয়াত, আলে ইমরান ৯৬ নম্বর আয়াত, আনআম ৯১ নম্বর আয়াত ...

অন্য আরেক দৃষ্টিতে (رحيميه) রহমত মহান প্রভুর জন্য নির্ধারিত এবং এখানে অন্য কারো উপস্থিতি নেই। পবিত্র এ হাদীসে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা অনুযায়ী (رحيميه) রহমত' এর বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে ঃ إنّ الرحمنَ اسمٌ خاصٌ لِصِفَةٍ عامَّةٍ , وَ الرحيمَ اسم عام لصفة خاصَّةٍ

রহমান একটি বিশেষ নাম যা সর্বাজনীন বৈশিষ্ট্যের জন্য আর রাহিম একটি সার্বজনীন নাম এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্বরুপ। ------

মাজমাউল বাইয়ান, ১মখন্ড ২১ পৃঃ (সামান্য পাথর্কে, ইমাম সাদেক (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে)

আরও বলা হয়েছে ঃ خاصَّةٍ الرحمن بجميع خلقهِ وَ الرحيمُ بالمؤمنينَ তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমান স্বরুপ, আর মুমিনদের জন্যে রাহিম।

আল্ মাহাসীন ২৩৮ পৃঃ। মাসাবিউল আল্ জালাস, জাবামে মিন তাউহীদ অধ্যায়ে ২১৩ নম্বর হাদীস। আল্ কুরআন ১খন্ড ৪৬পৃঃ (সুরা হামদের তফসির ৩নম্বর আয়াত)

আরও বলা হয়েছে ঃ يا رحمن الدنيا وَ رَحيمِ الاخرَة হে পৃথিবীর রহমান ও পরকালের রহীম ।

বিহার আল্ আনওয়ার ৮৮খন্ড ৩৫৫ পৃঃ। কিতাব আল্ সালাত, সালাত্ আল্ হাজাত্ অধ্যায় ১৯ নম্বর হাদীস।

আরও বর্ণিত হয়েছেঃ يا رحمن الدنيا وَ رحيمهما হে দুনিয়া ও আখেরাতের রহমান এবং পৃথিবী ও পরকালের রহীম।

– উসুল্ আল্ ক্বাফি ২খন্ড ৫৫৭পৃঃ , কিতাব আল্ দুয়া. দুয়া লিলকুরবী ওয়া আলাহুম্মা ... ৬নম্বর হাদীস। সাহিফে সাজ্জাদীয়া ৫৪ নম্বর দোয়া।

ইরফানী গবেষণা

ব্যাকারণবিদগণ বলেনঃ রহমত থেকেই রাহিম ও রাহমানের (আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশে) উৎপত্তি। তবে রহিমের তুলনায় রহমানে দয়াদ্রতার পরিমান (مبالغه মাত্রাধিক) অত্যাধিক। এতদসত্বেও রহমান ব্যক্তি কেন্দ্রিক জ্ঞানসম ও অন্য সকল অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগহীন হওয়ার কারণে প্রথমে অবস্থান নিয়েছে। অনেকে আবার শব্দদ্বয়ের একক অর্থ ধরে, বলেনঃ পূর্ণবৃত্তির কারণ হল বিশেষ গুরুত্বারোপ করা মাত্র।

ইরফানী উপলব্ধি যা পবিত্র কুরআনে সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে নিম্নে অবতরিত রুপ । তাদের উপলব্ধিতে রহীমের পূর্বে রহমান আসাটাই যথাপোযুক্ত। কেননা , সুফীসাধকদের নিকট পবিত্র কুরআন হল, প্রভুর তাজালি যা প্রতিপালকের লেখনী স্বরুপ সর্বোৎকৃষ্ট নাম সমুহ। অন্য দিকে রহমান নাম এ ক্ষেত্রে অন্য সকল নামের উর্ধ্বে মহান নাম (اعظم اسم) এর পর অবস্থান করছে । খোদার প্রেমিকদের নিকট প্রতিটি নামের তাজালিগত পরিবৃত্তির উপর ভিত্তি করেই তার প্রাধান্য তাই যে নামের তাজালিগত পরিধি যত ব্যাপক তার অবস্থান ততক্ষানি উর্ধ্বে বা শীর্ষে, বিষয়টি যুক্তিযুক্তও । এ কারণেই হযরতের বিশুদ্ধ সত্তায়حضرتِ واحديت প্রথম তাজালি হল সুমহান নাম (الله) এর তাজালি। অতঃপর (رحمانيت) নামের তাজালির অবস্থান , রাহিমিয়াতের (رحيميت) তাজালির পূর্বে রাহমানিয়াতের (رحمانيت) তাজালির অবস্থান । ঠিক একই ভাবে কাজের প্রকাশের তাজালিতেও মহান নাম (مشيت) এর তাজালি গত অবস্থান । এ প্রত্যক্ষ ভূবনে (মহান নাম সত্তাগত ভাবে প্রকাশিত) সমগ্র নামের তাজালি সর্বাগ্রে । রাহমানিয়াত (رحمانيت) অবস্থানগত তাজালি যা সমগ্র সৃষ্টি জগত দৃশ্য ও অদৃশ্যকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে – এ আয়াতে তার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে ।

رَحمتي وَسِعَت كل شيء

'আমার রহমত সমস্ত সৃষ্টিকুলকে পরিবৃত করে রেখেছে' –

–সুরা আরাফ ১৫৬ নম্বর আয়াত ।

আর অন্য তাজ্জালির পূর্বে অবস্থানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এখানে سبقت رحمته غضبَه

'তার রহমত আক্রোশের উপর প্রাধান্য পেয়েছে' –

ইলম আল্ ইয়াকীন ১ম খন্ড ৫৭পৃঃ । আল্ ক্বাফীতে মাগরীব ও প্রভাতী নামাজের ত্বাক্বিবতের দোয়াতে বলা হয়েছে سبقت رحمته غضبَه উসুল আল্ ক্বাফী ২য়খন্ড ৫২৯পৃঃ , কিতাব আদ্ দোয়া, আল্ কৌল ইনদাল আসবাহ্ ওযাল্ আমসা, অধ্যায় ২০ নম্বর হাদীস ।

মোটকথা (بسم الله) অন্তর ও আত্মানুযায়ী ক্রিয়াবাচক তাজালির আকার স্বরুপ । আর রহস্য ও রহস্যের রহস্য হিসেবে নামায়নের তাজালির আকার বরং সত্তাগত তাজালির রুপ স্বরুপ । উলেখিত তাজালির প্রথম (الله) আলাহ্ নামের অবস্থান । অতঃপর (الرحمن) রাহমানের অবস্থান । তারপর রাহিমেরالرحيم স্তর । ঠিক একই ভাবে ভাষ্য ও লেখনীর ক্ষেত্রেও এমন শ্রেণী বিন্যাস থাকা অবশ্যকীয়

যাতে প্রভু ও প্রতিপালকের সৃষ্ট বিশ্বনিয়ম নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ হয় । পবিত্র সুরা হামদে (رحمن) ও (رحيم) কিন্তু (العالمين ربٌ) পর আবস্থান করছে । এ রুপ অবস্থানের কারণ হয়ত (بسم الله) তে অস্তিতের চরম অদৃশ্য অবস্থান থেকে অস্তিত্ব প্রকাশের প্রতি দিকপাত করা হয়েছে । আর স্বয়ং পবিত্র সুরা প্রত্যাবর্তন ও অন্তর সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে । তবে এ জাতিয় ধারণা সমস্যা যুক্ত নয় । এমনও হতে পারে যে, (رحمانيه) ও (رحيميه) রহমতের প্রতি ইঙ্গেত করতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে । হয়ত অন্য কোন কারণও এখানে থাকতে পারে ।

মোটকথা (بسم الله) ব্যাপারে যে সকল বিষয়ের উলেখ করেছি এ সবই (আমার অন্তর সত্তায়) প্রমাণিত হয়েছে । এটাও হয়ত রাহিমিয়ার (رحيميه) রহমত ও কল্যাণ স্বরুপ যা এ অযোগ্য ব্যক্তির অন্তরে পতিত হয়েছে । وله الحمد على ما أنعم তাঁরই সমস্ত প্রসংশা যে নেয়ামত তিনি দান করেছেন ।

একটি পর্যালোচনা

কেউ কেউ বলেন ঃ রহমত শব্দ থেকেই রহমান ও রহীম শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি । এ দুটি শব্দের মধ্যে অনুকম্পা ও হৃদ্যতাপূর্ণ অর্থ নিহীত । এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে । الرَّقيقُ و الرَّحيمُ العطوُفُ على عِبادِهِ بِالرِّزقِ وَالنِّعَمِ إنهما اسمان رقيقان أحدهما أرقُّ مِنَ الاخَرِ فَلْرحمنُ

–এ নামদ্বয় অনুকম্পা মুলকনাম । তবে একটি অপরটি হতে অধিক অনুকম্পা স্বরুপ । সুতরাং রহমান হল অত্যাধিক দয়াময় আর রাহীম হল অনুগ্রহকারী , যে আপন বান্দাদেরকে জীবিকা ও নেয়ামত দান করে থাকেন ।

– আল্ দুরুল মানসুর ফি আল তফসির বিল মা'সুর –১খন্ড ৯পৃঃ , বাইহাকীর 'নাম ও গুণ' আলোচনা থেকে উদ্ধৃত ।

দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশে যেহেতু প্রতিক্রিয়ার (প্রতিপক্ষের) মুখাপেক্ষী । তাই পবিত্র সত্তায় সংযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও 'তাউইল' এর অবতারণা নিয়ে (مجاز) স্বরুপ ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন । আবার কেউ কেউ এ সকল ক্ষেত্রে (خُذِالغاياتِ وَاترُكِ المَبادى) 'মুল উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য সব প্রাথমিক অধ্যায় ত্যাগ কর' উপমার নীতিতে বিশ্বাসী ।

– আম্সাল ওয়া হুকম্ ২খন্ড ৭২৩ পৃঃ ।

তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হল পরম সত্যের সাথে এ জাতিয় অর্থের সংযোগ সৃষ্টি ক্রিয়া ও প্রতিফল স্বরুপ না, সুচনাগত ও গুণবাচক হিসেবে। তাই পরম সত্যের (رحيم) ও (رحمن) এর অর্থ এমনটি হবে যে, তার বান্দাদের সাথে রহমতের লেনদেন করেন । আরও আশ্চার্যজনক বিষয় হল 'মু'তাজিলাদের বিশ্বাস হল পরম সত্যের সকল বৈশিষ্ট্য সমূহ উলেখিত প্রকারের সুতরাং তাদের ধারণা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যগত সকল (حق) বাস্তবতার সম্পর্কই (مجاز) অযংগত বা আপেক্ষিক । মোটকথা যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন (مجاز) আপেক্ষিক হওয়ার সম্ভাবনা মোটেও নেই। বিশেষ করে রহমানের (رحمن) ক্ষেত্রে , তাদের ধারণা অনুযায়ী এক অদ্ভুত বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। আর তা হল, এ শব্দটি এমন একটি অর্থের জন্য সৃষ্টি হয়েছে যে অর্থে তার ব্যবহার অসম্ভব । এ জাতিয় নীতি সর্বমুলেই অবাস্তব। বস্তুতঃ হকীকত বা বাস্তবতা শুন্য এখানে (تامًّل) প্রয়োজন। এ জাতিয় সমস্যা ক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী মানুষদের উত্তর হল , শব্দ সমূহ সার্বজনীন অর্থে ও সার্বিক বাস্তবতার বিষয়বস্তু । তাই এ চিন্তানুযায়ী রহমত শব্দের বিষয় বস্তুর মধ্যে অনুকম্পা ও দয়াদ্রতার শর্ত

সন্নেবেশিত হয়নি। এ ধরণের প্রচলন অজ্ঞদের কল্পনা থেকে ধার নেওয়া হয়েছে। নতুবা মুল শব্দ সৃষ্টিতে এ জাতিয় কোন হস্তক্ষেপই নেই। এ বিষয়টি সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি যোগ্য যে, বিষয়টি গবেষণা বর্হিভুত । কেননা, সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি ঐ রুপ শব্দ সৃষ্টি করে সেও একজন মুর্খ ও সাধারণ ব্যক্তি। যে ব্যক্তি শব্দ সৃষ্টির সময়, (অন্য অর্থের প্রবেশ মুক্ত) বিশুদ্ধ অর্থ ও সামগ্রিক বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি রাখেনি।

প্রকৃত পক্ষে যে লক্ষ্যে শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে তাহল ঐ বিশুদ্ধ সামগ্রিক অর্থ । উদাহরণ স্বরুপ নুর শব্দটি যখন বিশেষ অর্থের জন্যে নির্ধারণ করতে চাইল । তখন নির্ধারকের দৃষ্টিতে নুরের যে বিশেষ কল্পনা তার স্মৃতিপটে ভেসে ছিল, যদিও সে নুর পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অস্থায়ী হয়ে থাক না কেন (তার মাধ্যমে অতেন্দ্রিয় নুর উপলব্ধি না হলেও) । তারপরও নুর শব্দের নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলোকের (নুরিয়াত, আলোকতা) দিকই ছিল প্রধান । আলো (নুর) ও আধারের সংমিশ্রিত রুপের প্রতি তার লক্ষ্য ছিল না । কেননা, শব্দ নির্ধারককে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, অস্থায়ী ও সসীম আলোকর মিশ্রন যুক্ত আলো বিশুদ্ধ আলো নয়। বরং আলো ও আধারের মিশ্রিত রুপ, তাই নুর শব্দ নির্ধারণে কোন দিকটি সন্নেবেশিত হয়েছে ? আলোক না আধারের মিশ্রন রুপ । এখানে নিশ্চিত উত্তর আসবে ঐ আলোকের দিকই শব্দ নির্ধারকের লক্ষ্য ছিল । আধারের দিকটি কখনও তার বিষয়বস্তুর মধ্যে সন্নেবেশিত হয়নি। একই ভাবে আমরা জানি আগুন শব্দটি যে নির্ধারণ করেছেন, এ নির্ধারণে পার্থিব আগুন ব্যতীত অন্য কিছু তার কল্পনায় ছিল না। আর এই পার্থিব আগুনই প্রকৃত ও পারলৌকিক আগুন উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভুমিকা পালন করে থাকে ।{نارُاللهِ الموقَدَةُ الّتي تطّلعُ على الافئدة আলাহ্‌র আগুন, যে অগ্নিশিখা (প্রথমেই) কলিজাকেই চুম্মন করে। – সুরা হুমাজা ৬,৭ নম্বর আয়াত। } অথচ এ জাতিয় আগুন তার কল্পনায় আসেনি । বিশেষ করে নির্ধারক যদি অন্য জীবন ও বিশ্বের প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে থাকে ।

মোটকথা , এ সকল সসীম মাধ্যম অনন্ত সত্য উপলব্ধির পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। বরং আগুন তার আগ্নেয় দিকই এখানে মুল লক্ষ্য। এমনটি নয় যে, নির্ধারক অর্থকে বিশুদ্ধ করে দিয়েছে যাতে বিষয়টি অদুরপরাহত হয়।

তাই আমরা বলতে চাই শব্দ তার নিধারিত অর্থের সম্মুখে (শর্ত মুক্ত ভাবে) দন্ডায়মান। সুতরাং এখানে কোন শক্তি প্রয়োগে বিশেষ (ভিন্ন) কোন লক্ষ্যকে সন্নেবেশিত করা হয়নি। শব্দ যতবেশী, অতিরঞ্জন ও অপ্রাকৃতিক প্রয়োগ মুক্ত থাকবে ততই সে যথার্থ অর্থের নিকতাবর্তী হবে এবং অসংযত ব্যবহার থেকে দুরে থাকবে। উদাহরণ স্বরুপ নুর শব্দটি যার বিষয় বস্তু হল, সে নিজে আলোকময় এবং অপরকে আলোকিত করে ।' যদিও এটা পার্থিব অস্থায়ী আলোক সংশিষ্ট বিষয় তবুও (পূর্ণরুপে) বিশুদ্ধ বাস্তবতা বা সত্য শুন্য নয়। কেননা, তার নির্ধারণে শর্তের দিক ও আধারের মিশ্রণই এখানে লক্ষ্য নয় ।বরং তার ঐ আত্মিক প্রকাশ ও অন্যকে প্রকাশিত করাই উদ্দেশ্য। তাই 'মালাকুত' এর নুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগটি যা অতি পূর্ণতম প্রকাশই তার সত্তাগত অর্থে অতি নিকটতম বিষয়। আর অন্যকে প্রকাশিত করার ক্ষেত্রেও (পরিমান ও গুণগত) আধারের সাথে মিশ্রন বা দূর্বলতা এখানে অনেক কম, বিশুদ্ধ নুরের অতি সন্নিকটে। এ ব্যাখ্যানুযায়ী 'জাবারুত' এর নুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ আরও বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করবে। একই ভাবে মহান পবিত্র সত্তা যিনি নুর সমুহের নুর, সমস্ত প্রকার আধার মুক্ত, বিশুদ্ধ নুর ও নুর বিশুদ্ধ , এখানে চরম বাস্তব ও বিশুদ্ধ প্রয়োগ সাধিত হবে।

বরং আমরা বলতে পারি, যদি নুর শব্দটি (নিজে প্রকাশিত ও অপরকে প্রকাশ ঘটায়) অর্থে উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে , মহান প্রভুর সত্তা ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিবেকের দৃষ্টিতে (عقول مؤيده) – দোষণ মুক্ত। আর (اصحاب معرفت) প্রজ্ঞাবিদ ও আরেফগণের নিকট অসংগত প্রয়োগ হিসেবে

বিবেচ্য হয়ে থাকে। কেবল চরম সত্য সত্তার ক্ষেত্রেই প্রয়োগটি হল বাস্তব ও যথার্থ প্রয়োগ। একই ভাবে যে সকল শব্দাবলীর (کمالیه) পূর্ণত্বের অর্থ প্রকাশ করে । অর্থাৎ অস্তিত্বগত ও পূর্ণত্ব স্বরুপ বিষয় বস্তু ।

অতএব আমরা বলব যে, রহমান রহীম, আতুফ, রাউফ, ও এ জাতিয় শব্দের মধ্যে এক দিকে রয়েছে পূর্ণত্ব আর অপর দিকে দূবলতা, অভাব, অক্ষমতা। তাই এ –শব্দ সমূহ তার পূর্ণত্বের দিক যা মুলতঃ বিশুদ্ধ ও সত্য এ বিষয় বস্তুর ভিত্তিতে অর্থ প্রকাশ করে। আর অক্ষমতাযুক্ত দিক যা চরম সত্য থেকে পার্থিব ও সম্ভবনাময় বিশ্বে অবস্থানের শর্তবিশেষ (এ নীচুতর বিশ্বে আলো ও আধারের সংমিশ্রণ ঘটে থাকে) তবু বিষয়টি অর্থের মুল বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না । সুতরাং যে সকল অস্তিত্ব কেবল পূর্ণত্ব দিকের অধিকারী অক্ষমতা ও অভাব মুক্ত, বিশুদ্ধ সত্য তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগই বিশুদ্ধ প্রয়োগ। বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করা হল। কেবল মরমী আরেফগনের মতামতের নিকটাবর্তী নয় বরং সাধারণ মানুষের বিবেক সম্মত বিষয়।

সুতরাং স্পষ্ট বোঝা গেল, এ জাতিয় পূর্ণত্ব মুলক বৈশিষ্ট্য সামগ্রিক ভাবে কোন কোন নিম্ন পর্যায়ের অবতরন প্রয়োজনীয় অন্য বস্তুর দোষণ মুক্ত (যা থেকে সুমহান সত্তা অতি পবিত্র) আলাহ্‌র ক্ষেত্রে প্রয়োগটি অসংগত প্রয়োগ নয়। আলাহ্‌ –ই হেদায়েত দানকারী ।

তাদের উক্তি ঃ 'আল্‌ হামদুলিলাহ' অর্থ সমস্ত প্রসংশা পবিত্র সত্তা প্রভুর জন্যে নির্ধারিত। হে প্রিয় পাঠকগণ জেনে রাখ! এ পবিত্র শব্দটির মধ্যে রহস্যের রহস্য লুকিয়ে আছে। সকল গুণকীতনকারীর (মুহামেদিন) ও সমস্ত গুণকীর্তন (মুহামিদ) মহান সত্যের জন্যে একান্ত ভাবে নির্ধারিত । এ বিষয়টি যুক্তির ভিত্তিতে প্রজ্ঞাবিদ, ও শ্রেষ্ঠ দর্শণের (প্রভুতত্ব) প্রবক্তাদের নিকট প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট। কেননা, উলেখিত যুক্তির ভিত্তিতে সমগ্র অস্তিত্ব জগত চরম সত্যের (ظلّ منبسط আবারণযুক্ত ছায়া ও (فیض مبسوط حضرت حق) অনুগ্রহের প্রতিবিম্ব । তাই প্রতিটি নেয়ামত نعم, প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য (যে কোন গুণকীর্তনকারী منعم থেকেই উৎপত্তি হোক না কেন, বার্হ্যিক ও সাধারণ জনগণের দৃষ্টিতে) সবই মহান ঐশয্যময় সত্য সত্তার জন্য নির্ধারিত। সৃষ্টির কোন অস্তিত্বের উপস্থিতি এখানে নেই । এমন কি পরিসখ্যানগত উপস্থিতির (شرکت اعدادی) সাধারণ দর্শনিকদের মতে থাকলেও শ্রেষ্ঠ দর্শণের দৃষ্টিতে নয়।

সুতরাং গুণকীর্তন যেহেতু নেয়ামত, অনুগ্রহ, ও দানের পরিপেক্ষিতে হয় তাই , বিশ্ব জগতে মহান প্রভু ব্যতীত অন্য কোন নেয়ামত দাতাই নেই। তাই সমস্ত প্রসংশা একমাত্র তাঁরই জন্যে নির্ধারিত । আবার কোন ঐশয্য ও সৌন্দর্য মহান প্রভু ভিন্ন থাকতেই পারে না। অতএব সমস্ত গুণকীতন তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

অন্য বর্ণনা, যে কোন ব্যক্তির প্রতিটি প্রসংশা ও গুণকীর্তন পূর্ণত্বে ও নেয়ামতের সুত্রে উৎপত্ত। নেয়ামত ও পূর্ণত্বের স্থান ও অবস্থান যার প্রতিবন্ধকতা ও সীমিত করেছে ঐ প্রসংশার ক্ষেত্রে তার কোন প্রকার উপস্থিতি এখানে নেই। বরং (তার উপস্থিতি) বৈপরীত্বমুলক, ও প্রতিবন্ধকতা স্বরুপই তাই সমস্ত প্রসংশা ও গুণকীর্তন প্রতিপালকেরই যিনি বিশুদ্ধ, পূর্ণত্ব ও ঐশয্যের অধিকারী তার প্রতিই প্রত্যবর্তন করবে । সৃষ্টির প্রতি নয়, যে অক্ষম ও সসীম ।

অপর একটি ব্যাখ্যায় , প্রভুর সত্তার (ফিতরাত) উপর ভিত্তি করেই সমগ্র সৃষ্টি সত্তা (ফিতরত) প্রাপ্ত। তাই সমগ্র প্রসংশা, গুণকীর্তন কৃতজ্ঞতা সবই নেয়ামত দাতারই। একই সাথে ঐশী সত্তার বৈশিষ্ট্য হল দূবলতা, অক্ষমতা, ও অপূর্ণ নেয়ামত বিমুখী। অন্যদিকে সমগ্র বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ নেয়ামত, ঐশয্য, ও পূর্ণত্ব সবই চরম সত্যের। আর অন্য সকল অস্তিত্ব ঐ বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ নেয়ামত ও

ঐশয্যকে সীমিত করে পরিবদ্ধ করে থাকে। আবার কখনও তার (ঐশী নেয়ামত ও ঐশয্য) বৃদ্ধি ও সৌন্দয্য পরিবর্ধণ সাধন করে না। সুতরাং প্রতিটি মানুষের সত্তা প্রসংশা প্রত্যাশী ও পবিত্র সত্তার গুণকীর্তনকারী [সৃষ্টিগত ভাবে]। তাই সে অন্য সকল [অপূর্ণ] সৃষ্টির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শণ করে। তবে যে সকল অস্তিত্ব তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা অনুযায়ী পূর্ণত্বের ভূবনে ও প্রেমের নগরীতে ঐশয্যময় সত্তায় বিলীন হয়ে গেছে, তাদের প্রতি প্রেম, ভালবাসা, প্রসংশা ও গুণকীর্তন, স্বয়ং প্রভুর প্রতি প্রেম ও প্রসংশাসম। (একই ভাবে প্রভুর বিশিষ্ট্য বান্দাদের প্রতি প্রেমও প্রভুর প্রতি প্রেম সমতুল্য)। এ পর্যন্ত আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা মধ্য পথের পথিকদের জন্য যারা এখনও বহুত্বের আবারণে বসবাস করছে। অথবা তারা সমস্ত প্রকার শির্ক গোপন কিংবা অতি সংগোপন থেকে এখন মুক্ত হতে পারেনি এবং নিষ্ঠা ও নৈতিকতার পূর্ণত্ব অবস্থানে উপণীত হতে পারেনি।

তবে পবিত্র অন্তরের অধিকারী আরেফদের যারা কোন কোন বিশেষ অবস্থানে বিলীন হয়েগেছে তাদের দৃষ্টিতে, সমস্ত প্রকার নেয়ামত, পুর্ণতা, ঐশয্য, মহত্ব সবই সত্তাগত তাজ্জালির সকার। তাই সমস্ত গুণকীর্তন ও প্রসংশা পবিত্র মহান সত্য সত্তা সম্পর্কিত বিষয়। বরং প্রসংশা হল তাঁরই এবং তাঁকেই। ১০কেননা, (بسم الله) এর সাথে (الحمدلله) সংশিষ্টতা এ অর্থের প্রতি নির্দেশ করে ।

জেনে রাখ! আলাহ্’ পথের পথিকগণের এ জাতিয় বিদ্যা পরিচিতির স্তর পর্যন্তই পরিতুষ্ট হয়ে থেমে যাওয়া কখনও উচিত হবে না । সমস্ত জীবন যুক্তির পিছে ব্যয় করে যা আবারণ সমুহ, বরং মহা আবারণ তা অর্জন করে ক্ষ্যান্ত হওয়া ঠিক নয়। কেননা, এ পথ, লাঠি হাতে১১ (যুক্তি বা দর্শণ) কিংবা সোলাইমানের পাখি১২ নিয়েও অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এ উদ্যান পুতঃপবিত্রদের উদ্যান। এ আলয় সফলকামীদের মন্দির। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্ম প্রীতির পাদুকা, ও পরিবার পরিজনের আসক্তি মুক্ত এবং আস্তার ভর একমাত্র সত্যের উপর না হবে, ততক্ষণ এ উদ্যানে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা, এ পবিত্র উদ্যানে মুখলাসিন ও শুদ্ধ মানবরা ব্যতীত পদচারণ করতে পারে না।

পথিক যদি নিষ্ঠার সত্যতা অবলম্বনে এ উদ্যানে পদচারণ করে, এবং সে যদি পায়ের পশ্চাতে পৃথিবী ও বহুত্বকে (তার কল্পনার কল্পবস্তু) ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। এরপরও যদি তার মধ্যে ‘আমি ব্যক্তির’ কিছু বিদ্যমান থেকেও থাকে তাহলে অদৃশ্য ভুবনের সাহায্যে তাকে ঐশী তাজ্জালির মাধ্যমে ‘আমি’ পাহাড় ঝলসে (বিলুপ্ত) হয়ে যাবে । তার অবস্থা , (মহান সত্তায়) বিলীন (فنا) ও (صعق) সম্মুখীন হবে। এ অবস্থান দুষিত অন্তর, যে অন্তরে পৃথিবীর কামনা–বাসনা ও সুখ, দুঃখ ব্যতীত অন্য খবর নেই, শয়তানী অহংবোধ ব্যতীত অন্য পরিচিতি নেই। তার কাছে অসংগত বোধ হবেই। মনে হবে অলীক কল্পনার কল্পতরী । অথচ আমরা আজ যে পৃথিবী ও প্রকৃতিতে যেভাবে বিলীন হয়ে আছি, যা আরেফগণ ও ঐশী পথের পথিকদের দাবীর চেয়ে বিস্ময়কর ও অশ্চার্য জনক ব্যাপার । কেননা, সামগ্রিক ভাবে সমস্ত অদৃশ্য ভুবন যে কোন দিক থেকেই হোক না কেন, এ বিশ্ব থেকে অধিক প্রকাশিত ও দৃশ্যিত। বরং পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী যা (একমাত্র তার সত্তার প্রকাশ) এ বিশ্ব ভ্রমন্ড, সম্পর্কে আমরা গাফেল আছি। শুধু তাই নয় ঐ ভুবন সমগ্র ও পরম বিশুদ্ধ ও পবিত্র সত্তা প্রমাণে যুক্তি ও মাধ্যমের আশ্রায় নিয়ে থাকি ?! যা পরিশুদ্ধ মানব ও পথিকেরা বিলীন (فنا) সম্পর্কে দাবী করে থাকে তার চেয়েও এটি বিস্ময়ের বিস্ময়কর কাহিনী ।

اخسٌ اندر حيرتاندر حيرت ايد زين قصص بی هشّی خاصگان

–মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী

যদি (اخصٌ) শব্দের শেষ অক্ষরটি (صاد) হয় তাহলে [আরেফদের ব্যাখ্যায়] এত অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, পূর্ণত্বে অপূর্ণের বিলীন একটা প্রাকৃতিক বিষয় এবং ঐশী সুন্নত

সম্মত নীতি । তবে যখন (اخسٌ) শব্দের শেষ অক্ষরটি (سين) হবে তখনই বিস্ময়কর বটে, বর্তমানে আমাদের সবার জন্যে এরুপ অবচেতন ও বিলীন সাধিত হয়েছে । কেননা, আমাদের শ্রুতিশক্তি, চোখ, সবই প্রকৃতিতে নিমজ্জিত ও বিলীন হয়ে আছে। যার কারণে অদৃশ্য ভুবনের গুলগুল্ শব্দ থেকে আমরা অজ্ঞত ।

গবেষণাধর্মী বর্ণনা ঃ

ব্যাকারণবিদগণ ও আধুনা পন্ডিতগণের মতে (حمد) হল মৌখিক ও ভাষ্যগত গুণকীর্তন। অবাক হতে হয় তাদের এ নির্বাচন দেখে! তারা মাংস পিন্ডের জ্বিবার ভাষা ব্যতীত অন্য সকল ভাষ্য থেকে গাফেল। একারণেই মহান সত্যের প্রতি গুণকীর্তন ও প্রসংশাকে বা পবিত্র সত্তার সামগ্রিক ভাষ্যে তারা এক প্রকারের রুপান্তরিত অর্থ চাপিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং (তাদের দৃষ্টিতে) মহান সত্তার কথার অর্থ ভাষ্যের উৎপত্তি ঘটানো। আর অন্য সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রসংশা ও গুণর্কীতন হল, সত্তাগত বিষয়। এ জাতিয় ব্যক্তিরা বস্তুতঃ ভাষ্যকে তাদের সমগোত্রিয় সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। তারা সুমান পবিত্র সত্তা ও অন্য সকল অস্তিত্বকে ভাষ্য শক্তিহীন ‘নাউজুবিলাহ্’ বোবা ধারণা করেছে। এ জাতিয় দৃষ্টি ভঙ্গীর মাধ্যমে তারা প্রভুর পবিত্র সত্তার, বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছে। অথচ এটা সংর্কীনতা বরং ধর্মের পথকে রুদ্ধ করে দেয় । প্রভু এ জাতিয় পবিত্রতা থেকে অনেক পবিত্র। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞ মানুষদের পবিত্রতা ঘোষণাও ক্রুটিযুক্ত ও (تحديد و تشبيه) শিরক্সম।

আমরা এর পূর্বেও উলেখ করেছি যে, কি ভাবে সার্বিক ও সার্বজনীন অর্থে শব্দের উৎপত্তি ঘটে। আর এখনও বলছি, ঐশী হকীকত প্রমাণে আমরা আভিধানিক অর্থ অথবা আভিধানিক সত্যতা যাচাইয়ের বাধ্য বাধকতার মুখাপেক্ষী নই । বরং এ সকল বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের মানদন্ড হল বুৎপত্তিক সত্যতা। অবশ্য আভিধানিক সত্যতাও পূর্বের আলোচনাতে প্রমাণিত হয়েছে । অতএব ভাষ্য, উক্তি, কথোপকথন, লেখনী, লেখা, গ্রন্থ, গুণ, প্রসংশা, এ সবের বিভিন্ন স্তর ও অস্তিত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থান রয়েছে। এদের প্রত্যেকেই তাদের অস্তিত্বগত অবস্থান ও আবির্ভাবগত স্তরের সাথে (مناسب) সম্পর্কযুক্ত।

যেহেতু প্রতিটি সুন্দরের পরিপেক্ষিতে প্রসংশা এবং ঐশয্য ও পূর্ণত্বের ক্ষেত্রে গুণকীর্তন মহান ঐশয্যময় প্রভু নিজের সত্তাগত জ্ঞান যে জ্ঞানের চুড়ান্ত স্তর উপলব্ধির ভিত্তিতে হযরত গেইব–ই (অদৃশ্য) ঐশয্য ও সৌন্দয্যের রুপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আপন সত্তাগত সৌন্দয্য প্রত্যক্ষে বিমোহিত হয়েছেন, যা চুড়ান্ত বিমোহন। অতপর হযরত সত্তায়, সত্তার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও চুড়ান্ত তাজ্জালিতে, প্রকাশিত হয়েছেন । এ তাজ্জালি, অদৃশ্যে বিদ্যমান সব কিছুরই প্রকাশ ও সত্তাগত পঠন (সাত্বিক উক্তি) যা সত্তার ভাষায় হযরত গেইব–এ অবস্থিত। আর সত্তাগত শ্রবন শক্তি এ ভাষ্যগত তাজ্জালিকে প্রত্যক্ষ করছে। তাই এটা সত্য সত্তার জন্যে, সত্তারই গুণকীতন যা উপলব্ধি করতে অন্যসকল অস্তিত্ব অক্ষম। যেভাবে পবিত্র সত্তা সর্বশেষ নবী যিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক ঐশী নৈকট্য প্রাপ্ত অস্তিত্ব তিনিও এ বিষয়ে নিজের অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করে বলেন ঃكمب أنتَ كَمبَ عَليكَ ثناءً أُحصى لاكسِفَن على أثنيتَ

ফুরু–ই ক্বাফী ৩য় খন্ড ৩২৪ নম্বর পৃঃ । সালাত গ্রন্থ ‘আস্ সুজুদ ওয়াত্ তাসবিহ্ অধ্যায়’ ১২ নম্বর হাদীস মিসবাহ্ আল্ মুত্তাহজিদ ৩০৮ নম্বর পৃঃ । মিসবাহ্ আশ্ শারিয়া পঞ্চম অধ্যায় । আওয়ালি আল্ লায়ালি ১ম খন্ড ৩৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা ২১ নম্বর হাদীস ।

এটা সুস্পষ্ট যে, প্রসংশার পরিগণনা, আর ঐশয্য ও পূর্ণত্ব পরিচিতি সংশিষ্টি বিষয়। এ জন্যেই যতক্ষণ সার্বিক ঐশর্য্যের পূর্ণ পরিচিতি লাভ ব্যতীত প্রকৃত প্রসংশাও প্রতিফলিত হয় না।
আরেফগণের চুড়ান্ত পরিচিতি হল অক্ষমতা পরিচিতি। পরিশুদ্ধ মানবরা বলে থাকেন । মহা সত্য সত্তা পঞ্চ মুখে কথা কলেন। আর এ ভাষ্য মুখ, সত্তাগত ভাষ্য অনুরুপ ।

(১)অদৃশ্য আহাদীয়াতের ভাষ্য (لسان احديّت غيب)

(২)সামগ্রিক ওহদিয়াতের ভাষ্য(لسان واحديّت جمعيّه)

(৩)বিস্তারিত নাম সমুহের ভাষ্য(تفصيليّه لسان اسماى)

(৪)রুপ সমুহের ভাষ্য(لسان اعيان)

উলেখিত ভাষ্য সমুহ প্রকাশিত ভাষ্য বর্হিভুত। যার প্রথম মাশিয়াতের ভাষ্য এবং রুপের সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত যেখানে [৫] বহুত্ব মুলক অস্তিত্বের ভাষ্য।(كثرات وجوديّه لسان)
জেনে রাখ! অদৃশ্য বিশ্ব যা বিশুদ্ধ জীবনী শক্তি স্বরুপ তার অমীয় সুধা সমস্ত অস্তিত্ব পেয়ে থাকে । যার ফলে সমগ্র সৃষ্টির জীবন সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এ বিষয়টি সর্বেচ্চ দর্শণের প্রবক্তাদের নিকট যুক্তির ভিত্তিতে আর বিশুদ্ধ আত্মার সুফী ও আরেফগণের কাছে প্রত্যক্ষ দর্শণ ও উপলব্ধির মাধ্যমে প্রমাণিত । প্রভুর পবিত্র আয়াত, ঐশী প্রতিনিধিদের (আঃ) ওহী ও বিভিন্ন বর্ণনায় উক্ত বিষয়ে পূর্ণ সর্মথন করে । সাধারণ [নিম্ন] দর্শণে অভিজ্ঞ ও আধুনা পন্ডিতগণ যারা সমগ্র সৃষ্টির ভাষ্যকে প্রমাণ করতে না পেরে বিভিন্ন ‘তাউইল’ ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে । কি আশ্চার্য ! যে পন্ডিতরা, ঐশী গ্রন্থ বুৎপত্তির ভিত্তিতে ‘তাউইল’ করার দায়ে দার্শনিকদেরকে কটাক্ষ করে। তারাই এ বিষয়ে অস্তিত্বের ভাষ্য উপলব্ধি করতে না পেরে এত সুস্পষ্ট আয়াত সাহি্ হাদীস সমুহকে ‘তাউইল’ করেছেন। অথচ তাদের এ জাতিয় তাউইলের পিছনে কোন প্রকার যুক্তিও নেই। তাই পবিত্র কুরআনের যুক্তি শুন্য ‘তাউইল’ করে বাধ্যতাপূর্ণ অর্থ করেছে ।

মোটকথা, অস্তিত্বের এ বিশ্ব আলায় মুলতঃ জীবন এবং জ্ঞান ও অনুভুতির রহস্যে পরিমন্ডিত। এখানে অস্তিত্ব সমুহের গুণকীর্তন, (তাসবিহ্) ভাষ্য মুলক গুণকীর্তন যা ইচ্ছা ও উপলব্ধি শক্তিতে সমৃদ্ধ। আবারণে আবৃত পন্ডিতদের কথামত সৃজন সত্তার ভাষ্য নয় । ঐ অস্তিত্ব সমূহ তাদের অস্তিত্বের পরিমান অনুপাতে অথবা অস্তিত্বগত অবস্থান হিসেবে সুমহান প্রভুর অবস্থান সম্পর্কে পরিচিতি বা জ্ঞান রাখে। কেননা, প্রকৃতির সাথে এত ঘনিষ্ঠতা অথবা নিমগ্নতা ও বহুত্বে এত অধিক নিমজ্জিত মানুষের মত আর অন্য অস্তিত্ব নেই । এদিক থেকেই মানুষ সকল অস্তিত্ব হতে অধিক পরিমান আবারণে পরিমন্ডিত। তবে মনুষ্যের পরগাছার বন্ধন খুলে, বহুত্ব ও অন্যাত্বের পরিচ্ছদ মুক্ত হতে পেরেছেন, সেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে আড়াল উন্মুক্ত ভাবে ঐশী ঐশয্য ও সৌন্দয্যের দর্পণ। অতএব তার প্রতি প্রসংশা ও গুণর্কীতন সকল প্রকার গুণর্কীতন ও প্রসংশা হতে পূর্ণাঙ্গ । সেই পরম সত্যকে তাঁর প্রভুত্বের সকল দিকসহ সমগ্র নাম সকল, ও গুণাবলীর প্রসংশা এবং ইবাদত করতে সক্ষম।
পরিদৃষ্ট

জেনে রাখ! পবিত্র শব্দ (الحمدلله) পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী এমন এক সামগ্রিক শব্দ, যদি কেউ তার সুক্ষ্ম রহস্য উপলব্ধি সহকারে পরম সত্যের প্রসংশায় লিপ্ত হয়। তাহলে, মনুষ্য ক্ষমতা অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব প্রসংশার দাবীদার তা সে পালন করতে পেরেছে। কেননা, আমরা পবিত্র হাদীসে এ অর্থের প্রতি ইঙ্গেত করেছি । যেমনটি একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ একদিন হযরত বাকের (আঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে দেখেন, তাঁর ঘোড়াটি স্বস্থানে নেই। তখন তিনি বলেনঃ যদি আমার ঘোড়াটি পাওয়া

যায় তাহলে আমি সুমহান প্রভুর যথার্থ গুণকীর্তন করব, যেমন গুণকীর্তনের তিনি দাবীদার। অতঃপর যখন ঘোড়াটি পাওয়া গেল তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বলেন ঃ আল্ হামদুলিলাহ্ ১২।

এ প্রসঙ্গেই মহানবী (সঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ (لا إله إلا الله) পরিমাপের অর্ধেক পরিমাণ। আর (الحمدلله) ১৩বাকী পরিমাণটুকু পূর্ণ করে দেয়। আমরা যে বিষয়ের বর্ণনা করেছি , এটা তারই মাধ্যমে সাধিত হয়ে থাকে এবং (الحمدلله) পূর্ণ তৌহিদও।

মহানবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি (الحمدلله) পাঠ করে তার পূর্ণীর পরিমাণ সাত আসমান ও সাত জমীন হতে অধিক ভারী ।১৪

তিনি আরও বলেন ঃ মহান প্রভু যদি কোন বান্দাকে সমগ্র বিশ্ব দান করেন, আর তার পরিপেক্ষিতে সে বান্দা আল্ হামদুলিলাহ্ পাঠ করে তাহলে, ঐ দানের চেয়েও তার জিকিরটাই অধিক মুল্যবান ।"১৫ একই ভাবে অন্য একটি হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন ঃ প্রভুর নিকট আল্ হামদুলিলাহ্ পাঠকারীর ন্যায় প্রিয় অন্য কোন বস্তু নেই। এ জন্য যে, মহান প্রভু নিজের প্রসংশা নিজেই করলেন ।"এ প্রসঙ্গে আরো অসংখ্যা হাদীস বিদ্যমান। মহান প্রভুর উক্তি ربُّ العالَمين এখানে (ربٌّ) অর্থ যদি সুমহান, সম্মানীয়, متعالی ثابت سيِّد হয় তাহলে সত্তাবাচক নাম। আর যদি প্রতিভু, মালিক, পরাক্রমশালী, ও قاهر مالك صاحب غالب হয় তাহলে গুণবাচক নাম । অথবা যদি প্রতিপালক, নেয়ামতদাতা, পুর্ণত্বদানকারী, مربّی منعم متمِّم অর্থে ধরা হয় তাহলে, ক্রিয়াবাচক নাম।

عالم শব্দের অর্থ যদি (ماسوی الله) আলাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু হয়, যা অস্তিতের সর্বস্তর ব্যাপী, অদৃশ্য ও দৃশ্য জগতের সমগ্র অধ্যায়ের সমষ্টি। তাহলে (ربٌّ) শব্দটিকে অবশ্যই গুণবাচক নাম স্বরুপ, ধরা উচিত। আর যদি উদ্দেশ্য বিশ্ব ভ্রমন্ডের সাত্বিক (عالم ملك) অবস্থান হয় যার পূর্ণত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হচ্ছে, তাহলে ক্রিয়াবাচক নামই হবে উদ্দেশ্য।

মোটকথা এখানে সত্তাবাচক নাম উদ্দেশ্য নয়। হয়তবা (عالمين) শব্দের লক্ষ্যবস্তু এই বিশ্ব ভ্রমন্ডের অন্তর সত্তা যার প্রতিপালন এবং ঐশী ইচ্ছার অধীনে তারা পূর্ণত্বের যথার্থ অবস্থানে উপনীত হবে। আর (ربٌّ) অর্থ বা লক্ষ্য হল, প্রতিপালক যা একটি ক্রিয়াবাচক নাম।

উলেখ্য যে, আমরা এ রচনায় পবিত্র আয়াতের ব্যাকারণগত বাক্যের গঠন প্রণালী, আভিধানিক ও সাহিত্যিক দিক সমূহ বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছি । কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সমালোচনা করা হয়েছে। তবে কোন কোন বিষয়ে কোন প্রকার সমালোচনা করা হয়নি । অথবা সংক্ষিপ্ত পরিসারে তাদের মতামত বর্ণনা করা হয়েছে ।

অবশ্যই জানা উচিত যে, এখানে যে নাম সকল 'সত্তাবাচক' গুণবাচক' ও 'ক্রিয়াবাচক' এর প্রতি যে ইশারা করা হয়েছে তা সবই পরিশুদ্ধ মানবদের বিশেষ পরিভাষায়। এ প্রসঙ্গে কোন কোন পরিশুদ্ধ মানবদের মুর্শিদগণ , 'ইনশাআ আল্ দাওয়ায়ের' নামক গ্রন্থে নাম সমুহের শ্রেণী বিন্যাস ['সত্তাবাচক নাম' গুণবাচক নাম' ও 'ক্রিয়াবাচক নাম'] করেছেন । যেমন ঃ 'সত্তাবাচক নাম'

و أسماء الذات هو الله: الربّ- الملک – القدوس- السلام المؤمن- المهيمن- العزيز- الجبار- المتكبر- العلى – العظيم – الظاهر – الباطن ٍ الاول – الآخر – الكبير- الجليل – المجيد – الحق – المبين – الواجد – الماجد ٍ الصمد – المتعالى – الغنى – النور – الوارث – ذوالجلال – الرقيب.

'গুণবাচক নাম'

اسماء الصفات وهى: الحى – الشكور – القهار – القاهر – المقتدر القوى – القادر – الرحمن – الرحيم – الكريم – الغفار – الغفور – الودود – الرؤوف الحليم – الصبور – البر – العليم – الخبير – المحصى – الحكيم – الشهيد – السميع البصير.

‘ক্রিয়াবাচক নাম’

و أسماء الأفعال هو: المبدى – الوكيل – الباعث – المجيب الواسع – الحسيب – المقيت – الحفيظ – الخالق – البارىء – المصور – الوهاب – الرزاق الفتاح – القابض – الباسط – الخافض – الرافع – المذل – الحكيم – العدل – اللطيف المعيد – المحيى – المميت – الوالى – التواب – المنتقم – المقسط – الجامع – المغنى المانع – الضار – النافع – الهادى – البديع – الرشيد.

এ জাতিয় শ্রেণী বিন্যাসের যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যদিও সকল নাম সমূহ সত্তাগত নাম। তবে সত্তার প্রকাশের উপর ভিত্তি করেই সত্তাবাচক নামকরণ করা হয়েছে। একই ভাবে গুণ ও ক্রিয়ার প্রকাশের ভিত্তিতে গুণবাচক নাম’ ও ‘ক্রিয়াবাচক নাম’ ধার্য্য করা হয়েছে। অর্থাৎ [বিষয় বস্তুর] প্রকাশ ক্ষেত্রে আধিক্যের ভিত্তিতে নাম করণ করা হয়ে থাকে। এ কারণেই আমরা কখনও কখনও দেখতে পাই কোন কোন নাম ২/৩টি বিষয়ে সমষ্টিবদ্ধ। এ জন্যে ‘সত্তাবাচক নাম’ গুণবাচক নাম’ ও ‘ক্রিয়াবাচক নাম’ এদের কোন দুটি অথবা তিনটি নাম ধারণ করেছে । উদহারণ স্বরুপ (ربّ) যেমনটি পূর্বে উলেখ করেছি। তবে এ বিষয়টি লেখকের উপলব্ধিতে যর্থাথ বোধ হয়নি এবং ইরফানী আবেগ বিরুধীও বরং এ শ্রেণী বিন্যাসে যে বিষয়টি আমার উপলব্ধিতে আসে, তাহল ঐ নাম সমুহের মানদন্ড হল তাদের পার্থিব বিশুদ্ধ পরিচিতি অবলম্বনে তাদের যে, ক্রিয়াগত বিলীনত্ব পরিসাধিত হয়, ফলে মহান সত্য সত্তা তাদের অন্তরে তাজালির উদ্ভব করেন । আর এটিই হল ক্রিয়াবাচক তাজ্জালি । এর পর ঐশী গুণে বিলীন হলে, গুণগত তাজ্জালি প্রতিভাত হয়ে ওঠে । অবশেষে সাত্মিক বিলীনত্বে তার প্রতি সত্তাগত তাজ্জালি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ।

এ পর্যায়ে যদি তার অন্তর সত্তা (উপরুক্ত) বিষয় সমুহ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয় তাহলে, বিলীনত্বের পর যা কিছু ক্রিয়াগত দর্পণ ব্যক্ত করবে তা ক্রিয়াবাচক নাম। একই ভাবে গুণগত দর্পণ (مشاهدات صفاتيّه) হবে গুণবাচক নাম এবং সাত্মিক নামও এরুপ। এ অবস্থানের বিস্তারিত (ব্যাখ্যা) রয়েছে যার ব্যাখ্যা এ অল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

‘ইনশাআ আল্ দাওয়ায়ের’ গ্রন্থে যা উলেখ করা হয়েছে, তা আমার অন্তর সত্তায় প্রতিভাত মানদন্ডের ভিত্তিতে ঠিক নয়। কেননা, নাম সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই ব্যাপারটি অনুধাবন করা যায়।

বলা যেতে পারে পবিত্র কুরআনেও নাম সমূহের ক্ষেত্রে এ জাতিয় (তিন পদের নাম, ‘সত্তাবাচক নাম’ গুণবাচক নাম’ ও ‘ক্রিয়াবাচক নাম’) শ্রেণী বিন্যাস প্রতিফলিত হয়েছে ।

সুরা হাশরের শেষের এ পবিত্র আয়াতটিতে মহান প্রভু বলেন اللهُ الذى لا إله عالمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيمُ ‘তিনিই আলাহ্ তা’য়ালা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন । তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা । ’

– সুরা হাশর্ ২২ নম্বর আয়াত ।

এ আয়াতটির প্রথম ভাগে সত্তাবাচক নামের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পযায়ে গুণবাচক নাম অতঃপর তৃতীয় বা শেষ ভাগে ক্রিয়াবাচক নাম সমূহের প্রতি ইঙ্গত করা হয়েছে। গুণের উপর

সত্তার প্রাধান্যতা ও ক্রিয়ার উপর গুণের প্রাধান্যতা, এ সকল অবস্থান অস্তিত্বগত রহস্য এবং প্রভুর তাজ্জালির ধারাবাহিক পর্যায় ক্রমের ভিত্তিতে। না, প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ ও সুফিদের অন্তরে তাজ্জালির ধারাবাহিকতার মানদন্ডের ভিত্তিতে।

জেনে রাখা উচিত যে, পবিত্র এ আয়াতটির অন্য আরেকটি রহস্য রয়েছে, যা বর্ণনা এ পর্যায়ের [পথিক বা শ্রেণীর জন্যে] উপযুক্ত নয়। উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় অংশ, গুণবাচক নাম ও শেষাংশ ক্রিয়াবাচক হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট । তবে (عالم الغيب و الشهاده) , (رحمن و رحيم) ও সত্তাবাচক নাম হওয়াটা নির্ভর করে, (غيب) ও (شهادت) প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নাম হওয়ার উপর । আর (رحمانيت) হল (فيض اقدس) এর তাজালি ,না (فيض مقدس) । 'জিকির' বা যপের জন্য এ নাম দ্বয় বিশেষ ভাবে নির্ধারন করা হয়েছে । অথচ (حیُّ) ও (ثابت) ও (ربّ) বা এ জাতিয় নাম সকল সত্তা বাচক নামের অধিক নিকটতর মনে হয় । হয়ত বা তাদের পরিবৃত্তির আয়তনের কারণে । কেননা , এগুলো নাম সমুহের জনক সমতুল্য । মহান আলাহই সর্বাজ্ঞ ।

টিকা ঃ

এ শব্দের (عالمين) উৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে মহা মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে বলেন ঃ (عالمين) সমষ্টি বা বহুবাচক শব্দ, যা সমস্ত প্রকারের সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তাই বস্তুগত হোক কিংবা অবস্তুগত বিশ্ব ভ্রমন্ডের যে কোন প্রকারের [অস্তিত্ব] হোক না কেন । তাদের কথায় এ বহুবচনের কোন একবচন নেই। এ উক্তিটিই প্রশিদ্ধ উক্তি কেউ কেউ বলেছেন ঃ যে, (عالم) ফাতাহ্ যুক্ত লাম শব্দটি নাম বাচক বিশেষ্য। আর () জের যুক্ত লাম হলে, নাম বাচক কর্তা ; এখানে (عاليمن) অর্থ হল (معلومين) বা জ্ঞাত বিষয়। এ জাতিয় অভিমত স্বয়ং নিজেই প্রমাণ শুন্য বিষয়। আর (ربّ المعلومين) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ সমন্ধহীন ব্যাপার ও সুদুর পরাহত বিষয়।

উলেখিত বিষয়টি আবার কারো ধারণা মতে (علامت) থেকে উপত্তি। এ ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার অস্তিত্ব সামিল হয়। কেননা, সকল প্রকার অস্তিত্ব মহান আলাহর নির্দশন স্বরুপ। তারা আরো বলেন ঃ (واو) ও (نون) বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণীর জন্য ও অন্য সকল অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার কেউ কেউ (علم) থেকে উৎপত্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মোট কথা সমস্ত প্রকার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এ শব্দের প্রয়োগ র্নিভুল ও যথার্থ প্রয়োগ।

তবে (عالم) প্রয়োগ হবে (الله ما سوى) এর উপর। তাই সকল শ্রেনী ও প্রকারের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। যদি কোন সাহিত্যিক বা ব্যাকারণবিদ মানুষ (عالم) শব্দটিকে সকল প্রকারের অস্তিত্বের উপর প্রয়োগ করে তাহলে এই ভিত্তিতে যে, সকল অস্তিত্ব মহান প্রভুর নিদর্শণ বিশেষ। আর সুফী সাধকগণের প্রয়োগের ভিত্তি হল প্রতিটি অস্তিত্বের সামষ্টিক নামের প্রকাশ, ও সার্বিক বাস্তবতা সমষ্টি (و فى كل شيء له آية) আহাদীয়াতের এর প্রকাশের পন্থায় সমষ্টিবদ্ধ সার্বিক বাস্তবতা ও অস্তিত্ব রহস্য। এ দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব ভ্রমন্ডের যে কোন অংশকে মহান নাম, যা আহাদীয়াতের অবস্থানে সমষ্টিবদ্ধ হিসেবে ধরা অসম্ভব و الأسماء كلها فى الكل و كذا الآيات. ।

উলেখিত বিষয় বস্তুর ভিত্তিতে মহান দার্শনিক সাদরুল মিলাত ওয়া আদ্দীন (কুঃ) এর সমালোচনা যেমন বেইদাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কেননা, তারা এপন্থা উপলব্ধি করতে পারেনি। আর ইরফানী পন্থায় উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক নয়। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের ব্যাখ্যায় দার্শর্নিক ও বেইদাবীর দীর্ঘ আলোচনা সমুহ এখানে উলেখ করলাম না। কেউ যদি বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হয় তাহলে মরহুম দার্শনিকের সুরা হামদের তফসির দেখুন।

(ربّ) যদি গুণবাচক নাম হয় তাহলে, মালিক বা প্রতিভু অথবা এ জাতিয় অর্থ দিবে। অবশ্য (عالمین) এর উদ্দেশ্য সমস্ত আলাহ্‌ বর্হিভুত (ما سوی الله) হওয়ার সম্ভবনাও রয়েছে। তাই সে বস্তু জগতের অস্তিত্ব অথবা অদৃশ্য অবস্তুগত অস্তিত্বই হোক না কেন। তবে যদি ক্রিয়াবাচক নাম হয়, (এটাই সর্বাধিক প্রকাশিত) তখন (عالمین) এর অর্থ হবে কেবল এ বস্তু জগত। কেননা, এ মুহুর্তে (ربّ) শব্দের অর্থ প্রতিপালক স্বরুপ দাঁড়াবে। এ জাতিয় অর্থে ক্রমপর্যায় অর্ন্তনীহিত আর অদৃশ্য জগতের অবস্তুগত অস্তিত্ব ক্রম ধারা হতে পবিত্র। অবশ্য লেখকের নিকট এক অর্থে ‘রুহ’ এর অর্থে ক্রমধারা (تدریج) অদৃশ্য বিশ্বের সন্নেবেশিত আছে।

এ অর্থেও উপর ভিত্তি কওে কালগত সৃষ্টিশীলতা যা, কালে আত্ম অর্থে ও ক্রমধারার অদৃশ্য ভুবন (عوالم مجرده) অবস্তুগত বিশ্ব সমুহে অর্থ করেছি। এ ভাবে ইরফানী পন্থায় কালগত সৃষ্টিশীলতা, সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রমাণিত হয়েছে। তবে বিষয়টি ‘মুতাকালিমীন’ তর্কশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বা ‘মুহাদ্দেসীন’ হাদীস শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যানুরুপ।

অন্য একটি টিকা ঃ

জেনে রাখ! হামদ যেহেতু (جمیل) সৌন্দয্যের পেক্ষাপটে। অবশ্য পবিত্র কুরআন থেকেও বিষয়টি উদ্ধার যোগ্য যে, প্রসংশা ও গুণকীর্তন মহান নাম, যা সামগ্রিক তাঁরই জন্যে। যে নামের জন্য বিশ্বের প্রতিপালকত্বের অবস্থান (رحمانیّه) ও (رحیمیّه) এর রহমত এবং (مالك یوم دین) এর অবস্থান নির্ধারিত। সুতরাং এ পবিত্র নাম সমুহ অর্থাৎ (ربّ – رحمن- رحیم- مالك) কে গুণকীর্তন ও প্রসংশার ক্ষেত্রে অবশ্যই এদের যথার্থ ভুমিকা রয়েছে। আমরা এ অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায় মহান প্রভুর এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বিষয়টি উলেখ করব।

এবার আমরা প্রসংশার ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীদের প্রভুত্বগত অবস্থান সম্পর্কে কথা বলবো। যে বিষয়টি দুদিক থেকে অভিন্ন রুপ ধারণ করেছে ।

প্রথমত ঃ গুণকীর্তন যে বিশ্ব –ভ্রমন্ডের অংশ বিশেষ নয় বরং স্বয়ং সে নিজেই বিশ্ব ভ্রমন্ড। সুফি সাধকদের দৃষ্টিতে বিশ্বের প্রত্যেকটি অস্তিত্ব নিজেই বিশ্ব সমতুল্য।

সত্যের গুণকীর্তনের মাধ্যমে সে, প্রভুত্বের অবস্থানের শক্তি দ্বারা দূর্বলতা, অপুর্ণতা ত্রাস, হাইউলাগত অনিস্তিত্বের আধারকে শক্তিশালী, পুর্ণতা, বিনয় ও মনুষত্ব্যের আলোক ভুবনে অবতরণ করবে। তখন সে বস্তুগত স্তর পেরিয়ে বস্তগত উপাদান, খনিজ উপাদান, বৃক্ষসত্তা, ও পাশবিকত্বকে সুশৃংঙ্খল নীতির ভিত্তিতে সত্তাগত গতি দ্বারা, সত্তাগত ও পাহাড়ী সৃষ্টি জগতের প্রেমবন্ধন অতিক্রম কওে মনুষত্ব্যের স্তরে যা, সকল স্তরের শ্রেষ্ঠস্তর সেখানে পৌছে দেয়। এরপরও তাকে প্রতিপালিত করে এমন পর্যায় উপনীত করে যা তোমার কল্পনায় আসে না, তাই হবে ।

কবিতা ঃ

আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব যেমন নিশ্চিহ্ন হয় অমিয় রাগ

গাইব আমি ফিরে এসেছি তোমার কাছে

দ্বিতীয়ত ঃ যেহেতু এ বিশ্ব ভ্রমন্ডের গ্রহ- নক্ষত্ররাজী উপাদান সমুহ, সত্তা সমুহ, অস্থায়ী সত্তা সমুহ সবই পূর্ণ মানব (অস্তিত্ব) নির্মাণের ভুমিকা স্বরুপ। প্রকৃতপক্ষে এ জাতকই বিশ্ব ভ্রমন্ডের নির্যাস বা সারবস্তু স্বরুপ এবং বিশ্ববাসীদের চুড়ান্ত লক্ষ্য। এ কারণেই সে সবশেষে সৃষ্টি হয়েছে। আবার যেহেতু সৃষ্টি জগতের সর্বপরি অস্তিত্ব সত্তাগত গতি দ্বারা গতিমান, যাদ্দারা তাদের এ সত্তাগত গতি পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই এ গতি যেখানেই পরিসমপ্তি হোক না কেন , সেটাই সৃষ্টির চুড়ান্ত লক্ষ্য ও গতির শেষ সীমানা। আমরা যদি সার্বিক ভাবে দৃষ্টিপাত করি, সার্বিক বস্তুতে, (جسم كل) সার্বিক প্রকৃতিতে (طبع كل) সার্বিক বৃক্ষ সত্তায় (نبات كل) সার্বিক পশুত্বে حيوان كلও সার্বিক মনুষত্ব্যে انسان كلতাহলে দেখতে পাব মানুষ সর্বশেষ নির্যাস যা বিশ্বের সত্তাগত গতির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এখানে পরিসমপ্তি ঘটেছে। সুতরাং সমগ্র অস্তিত্ব জগতে মহান সত্য সত্তার প্রতিপালক মুলত হস্ত মোবারক (শক্তি) মানব নির্মাণে নিমগ্ন তাই মানবই হল প্রথম এবং সমপ্তি।

অতীতে যে উলেখ করেছি অপূর্ণ ক্রিয়ায়, অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। নতুবা সার্বিক ক্রিয়া হিসেবে, মহান সত্তার ক্রিয়ার লক্ষ্য অবিত্র সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। একই ভাবে আমরা আংশিক ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই মানব সৃষ্টির লক্ষ্য সার্বিক অদৃশ্য ভুবন, যেমনটি পবিত্রতায় বর্ণিত হয়েছে لاجلك وخلقتكِ لأَجلي يا بن آدم خلقت الأشياءَ

হে আদম সন্তান, আমি সমস্ত কিছুকেই তোমার জন্যে সৃষ্টি করেছি । আর তোমাকে আমার জন্যে সৃষ্টি করেছি।

এলমুল ইয়াকীন ১খন্ড ৩৮১ পৃঃ ।

একই ভাবে পবিত্র কুরআনে মহান প্রভু হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আঃ) সম্পর্কে বলেন ঃ

তোমাকে আমার জন্যই তৈরী করেছি واصطنعتك لنفسي

সুরা ত্বাহা ৪১ নম্বর আয়াত।

মহান প্রভু আরো বলেন ঃ وأنا اختَرْتُكَ‘আমি তোমাকে নির্বাচন করেছি’

– সুরা ত্বাহা ৪১ নম্বর আয়াত

অতএব মানব নির্মাণ ও সৃষ্টি হয়েছে (لاجل الله) পবিত্র সত্তার জন্য । সমগ্র অস্তিত্বের জন্য তাকেই নির্ধারণ ও র্নিবাচন করা হয়েছে। তার গতির লক্ষ্য হল প্রভুর দ্বার প্রান্তে উপণীত হওয়া ও আলাহ্ সত্তায় বিলীন হওয়া এবংবিলীনত্ব থেকে প্রত্যাবর্তন। তার মা‘আদ পুনরুত্থান হল প্রভুর প্রতি , ‘আলাহ্ হতে, ‘আলাহ্’ তে, আলাহ্ দ্বারা।

যেভাবে প্রবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ إيابَهُم إنَّ ألينا

নিশ্চয় তারা আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে – সুরা গাশিয়া ২৫ নম্বর আয়াত।

আর অন্য সকল অস্তিত্ব মানুষের মাধ্যমে সত্যে প্রত্যাবর্তন করবে। বরং তাদের প্রত্যাবর্তন বা মা‘আদ, মানব (সত্তাতে) সংঘটিত হবে। যেভাবে ‘জিয়ারাতে জামইয়া’ তে বেলায়েত বা কতৃত্ব মুলক অবস্থানের অংশ বিশেষের প্রকাশ করেছেন, বলেন ঃ তোমাদের প্রতিই সৃষ্টির প্রত্যার্বতন ঘটবে এবং তাদের হিসেবে নিকাশ তোমাদের হাতেই ন্যস্ত। মহান প্রভু তোমাদের কারণেই (সৃষ্টির) সুচনা করেছেন। অতঃপর তোমাদের মাধ্যমেই পরিসমপ্তি ঘটাবেন।

و إيابُ الخلق إليكم وحسابهم عليكم] সৃষ্টির প্রত্যাবর্তন তোমার প্রতি এবং তাদের হিসাব নিকেশ তোমার হাতের আরো বলা হচ্ছে بكم فتح الله وبكم يَخْتِمْ মহান প্রভু তোমাদের কারণেই (সৃষ্টিকে) সূচনা করেছেন এবং তোমাদের দ্বারাই পরিসমপ্তি ঘটাবেন ।

– আইনু আখবার আর রেজা, ২খন্ড ২৭, ২৮ পৃঃ। মান লা ইহাদারুল ফাক্বী ২খন্ড ৩৭০ –৩৭৪ নম্বর পৃঃ, মা ইয়াজ্জি মিনাল কাইলী ইনদা জিয়ারতে জামিইউল আয়েম্মা আলাইহিচ্ছালাম, অধ্যায়ের ২য় হাদীস

যেভাবে পবিত্র আয়াতে বলা হয়েছে ঃإنَّ ألينا إيابَهُم ثُمَّ إنَّ عَلَيْنا حسابَهُمْ

– সুরা গাষিয়া ২৫ ও ২৬ নম্বর আয়াত।

‘জিয়ারতে জামইয়া, তে বলা হয়েছে ঃ এখানে তাওহীদের রহস্য সমুহের রহস্য ও পূর্ণ মানবে প্রত্যাবর্তনই ‘আলাহ্’ তে প্রত্যাবর্তন সমতুল্যের প্রতি ইঙ্গেত করা হয়েছে । কেননা, পূর্ণ মানব ‘আল-াহ’ সার্বিক ভাবে বিলীন হয়ে আলাহর উপস্থিতিতে সে উপস্থিত এবং তার নিজের পক্ষ থেকে কোন পরিসীমা, আমিত্ব বা আমি ব্যক্তির উপস্থিতি নেই। বরং সে সবোৎকৃষ্ট নাম সমুহের ও মহান নাম (এর প্রকাশ) । এ প্রসংঙ্গে পবিত্র কুরআনে ও হাদীস সমুহে অসংখ্য নির্দশন রয়েছে।

পবিত্র কুরআন এমন পরিব্যাপ্ত, রহস্যময়, ও সুক্ষাতিসুক্ষ রহস্য দ্বারা পরিমন্ডিত যেখানে সুফি সাধকদের বুৎপত্তি বিমূঢ় হয়ে থাকে। আর এটাই হল ঐশী নুরানী আলোকময় পত্রের সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর মু’জিযা। কেবল বৈকারনিক শ্রেণী বিন্যাস ও সাহিত্যধর্মী বর্ণনা ও চুড়ান্ত অলংকার, ভাষার গাথুনী এবং সাবলীলদর্মী উচ্চাঙ্গের অর্থ প্রকাশই নয় ।

বরং বলা যায় পবিত্র কুরআনের অন্য সকল মুযিজার উপর ফাসাহাতের (অলংকার শাস্ত্রগত) মুযিজা অধিক প্রশিদ্ধ লাভ করেছে। এর কারণ হল, ইসলামের প্রথম যুগের পন্ডিতগণ এ বিষয়েই কেবল পারদর্শী ছিল। তাই তারা কেবল এ বিষয় ভিত্তিক মুজিযাকে উপলব্ধি করেছেন। অথচ এরও চেয়ে উন্নত দিক ও উপলব্ধি যোগ্য মুজিযাও যে সেখানে বিদ্যমান তা সে যুগের আরবরা অনুভব করতে পারেনি। এখনও যারা তাদের সমপর্যায়ের (চিন্তাশীল) মানুষ তারাও শব্দের গাঁথুনী, বর্ণনা ভঙ্গীর সৌন্দর্য ব্যতীত এ সকল ঐশী রহস্য অনুধাবনে সক্ষম নয়। তবে যারা সুক্ষ্ম জ্ঞানের সুক্ষ্ম বিষয়বস্তু ও রহস্যবলীর সাথে পরিচিত তারা তাওহীদের রহস্য ও বস্তু সত্তা বর্হিভুত বিশ্বের খবর রাখেন। তাদের দৃষ্টিতে এ এশী গ্রন্থের যে দিকটি তাদের মন কেড়ে নেয়, সে দিকটি হল, আসমানী ওহীর ঐ জ্ঞানগত বিষয়বস্তু যা তাদের কামনার ক্বাবা ভবন। এ ছাড়া অন্যদিকে তাদের তেমন কোন আকর্ষণ নেই।

যদি কোন ব্যক্তি কুরআন ভিত্তিক ইরফান ও ইসলামী আরেফগণ যারা পবিত্র কুরআন থেকে এ জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ করেছেন তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন। আর একই সাথে অন্য সকল ধর্মের আলেমগণ, গ্রন্থ ও তাদের জ্ঞানের প্রতি তুলনা মুলক লক্ষ্য করেন, তাহলে ইসলামী জ্ঞান, কুরআন ও কুরআনের ভিত্তি, যা ধর্ম ও ধর্মীয় সকল ভিত্তির ভিত্তি, এবং রাসুল অবতরণের (আল্ কুসওয়া) লক্ষ্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন। তখন তার নিকট এ গ্রন্থ এশী গ্রন্থ ও পরিচিতি এশী পরিচিতির সত্যায়নে প্রমাণের প্রয়োজন হবে না।

জাগ্রত ঈমান ঃ

জেনে রাখ! সুমহান পরম সত্য সত্তার প্রতিপালকত্ব বিশ্ববাসীর ক্ষেত্রে দু’প্রকারের ঃ

প্রথমত ঃ সার্বজনীন প্রতিপালকত্ব ঃ যেখানে সমগ্র অস্তিত্ব বিদ্যমান। আর সেটা হল (ربوبيّت عامّه) সাত্মিক প্রতিপালন যা প্রতিটি দূর্বল অস্তিত্বকে প্রতিপালকের কতৃত্বের ছত্রতলে তার যথার্থ

পূর্ণতায় পৌছে দেয়। এ ভাবে প্রতিটি প্রাকৃতিক সাত্বিক গতিক, স্থায়ী ও অস্থায়ী সত্তার পরিবর্তন বিবর্তন মুলক উন্নতি সবই প্রতিপালকের কতৃত্বে সাধিত হয়ে থাকে। মোটকথা, বস্তুগত উপাদানের অবস্থান ও প্রাথমিক হাইউলা (هیولای اولی) থেকে পাশবিক স্তরে, দৈহিক শক্তি ও পাশবিক সাত্মিকতা, এদের প্রত্যেকই (تربیت تکوینی) অস্তিত্বগত প্রতিপালনে সাক্ষ্য সেয় যে, সুমহান ঐশয্যময় ও পরাক্রমশালী আলাহ্ আমাদের প্রভু।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রতিপালকত্বের আরেকটি স্তর হল (تشریعی ربوبیّت) শরীয়তগত প্রতিপালকত্ব যা একমাত্র মানব জাতির জন্য নির্ধারিত। এ জাতিয় প্রতিপালকত্ব থেকে অন্য সকল অস্তিত্ব বঞ্চিত। এ প্রকারের প্রতিপালন ও মুক্তির পথে হেদায়েত এবং মনুষ্যত্বের সাফলতায় উত্তীর্ণের পথ উপস্থাপন, যে পথ নবীদের (আঃ) মাধ্যমে বিকাশিত হয়েছে। তাই যদি কেউ স্বইচ্ছায় নিজকে বিশ্বভ্রমন্ডের প্রতিপালকের প্রতিপালন ও কতৃত্বাধীনে সোর্পদ করে শ্রেণীর প্রতিপালনের প্রতিপালক হয়। অর্থাৎ তার বার্হিক ও অভ্যান্তরিণ অঙ্গ প্রতঙ্গ ও শক্তি সমুহকে (قوای ظاهریّه و باطنیّه) প্রবৃদ্ধি শক্তির শাসন মুক্ত হয়ে প্রভু ও প্রতিপালকের আয়াত্বাধীনে প্ররিচালিত হবে। তখন পূর্ণ মনুষ্যত্ব যা এ মানুষের জন্য নির্ধারিত স্তর সেখানে সে উপণীত হবে।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পাশবিক স্তরে অন্য সকল পশুকে সহযাত্রী, এ অধ্যায়ের মানুষদের সম্মুখে দু'টি পথ অবস্থান করছে যা অবশ্যই তারই ইচ্ছাশক্তিতে অতিক্রম করতে হবে।

(১) সাফল্যের অধ্যায়, যা বিশ্ব ভ্রমন্ডের প্রতিপালকের সরল সোজা পথ। (إنَّ رَبِّی علی صِراطٍ مُستَقِیم) নিশ্চয় প্রতিপালক সত্য পথে আছেন। – সুরা হুদ ৫৬ নম্বর আয়াত ।

(২) (راه شقاوت) যা শয়তান শাসিত পথ। অতএব কেউ যদি আপনার শক্তি সমুহকে ও অঙ্গ প্রতঙ্গের রাজত্বকে বিশ্ব ভ্রমন্ডের প্রতিপালকের কতৃত্বাধীনে অর্পণ করে এবং তার প্রতিপালকে লালিত পালিত হয়। তাহলে ক্রমশঃ তার অন্তর এ বিশ্বের বাদশা , সেও অবনত হয়ে আসবে। তাই যখন অন্ত র বিশ্ব ভ্রমন্ডের প্রতিপালকের প্রতিপালন ও পরিচালনায় পরিক্রমন করবে। তখন অন্য সকল শক্তিরাও এ প্রতিপালকেই অনুধান করে চলবে এবং এ বিশ্ব তারই একচ্ছত্র আনুগত্যে পতিত হবে। এ সময়ে সে তার অদৃশ্য ভাষা (لسان غیبی) যা অন্তর সত্তার প্রতিবিম্ব তাদ্বারা বলতে শিখবে رَبِّی الله جَلَّ جَلالُهُ

সমাধী জগতে ফেরেস্তাদের প্রশ্নের উত্তরে مَنْ رَبُّكَ. ? তোমাদের প্রভুকে ? আর যেহেতু এ শ্রেণীর মানুষ যে নিশ্চয় মহানবী, সত্য পথের প্রদর্শকদের আনুগত্য , ও ঐশী গ্রন্থে কার্য সাধন করেছে। তাই তার ভাষ্য এ কথা বলতে স্বক্রীয় হয়ে উঠবে محمّد صلّی الله علیه و آله نبیّی- و عَلِیٌّ و اَولادُهُ المَعصُومینَ اَئِمَّتی- وَالْقُرآنُ كِتابِی

আর তার অন্তর যদি ঐশী ও প্রতিপালকীয় না করে এবং (وَلِیُّ الله لا إله إلاّ الله- مَحَمَّدُ عَلیٌّ رَسُولُ الله-) অন্তর পটে গ্রথিত হয়ে সত্তার অভ্যন্তরে আকার ধারণ না করে। সে যদি পবিত্র কুরআনে আমল ও চিন্তা ভাবনা, ধ্যান ও যপ না করে এবং তার সাথে কুরআন ও কুরআনের সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা সৃষ্টি না হয়ে থাকে। তাহলে মৃত্যুতে আক্রান্ত বিমূর্ষ মুহুর্তে কঠিন অবস্থায় অথবা স্বয়ং মৃত্যুই যা মহা ভীতিকর তখন সমস্ত অর্জিত জ্ঞান তার স্মৃতিপট থেকে মুছে বা উধাও হয়ে যাবে।

হে প্রিয়, মানুষ একটি সান্নিপাতিক জ্বর বা মস্তিস্কীয় দূবলতার কারণে তার সমস্ত স্মৃতি শক্তি ভুলে যায় । তবে যে সকল বিষয় চরম স্মৃতিচারন ও যপের মাধ্যমে ঐ জিকিরের সাথে নিজের আত্মার অনুরাগের বন্ধনে সত্তায় পরিণত হবে । তাছাড়া মানুষের জীবনে যদি কোন বড় ধরণের দূঘটনা, বা

অসহনীয় অঘটন ঘটে তখন অনেক কিছুই সে বিস্মৃত হয়ে যায়। তার স্মৃতি পট থেকে অনেক জ্ঞাত বিষয় খসে পড়ে। অতএব সে ঐ মৃত্যু শয্যায় বিমূর্ষ মূহুর্তে কি করবে? তার অন্তরের শ্রুতি শক্তির বিকাশ না ঘটলে, অন্তর শ্রুতি শক্তিধর না হয়। তাহলে মৃত্যুর মূহুর্তে 'বিশ্বাস মূলক' তালক্বীন মরণের পর তার জন্য কোন প্রকার সুফলই বয়ে আনতে পারবে না। তালক্বীন তাদের জন্যেই সুফল বয়ে আনবে যাদের অন্ত বিশুদ্ধ বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত আছে। তাদের তাদের অন্তরের কর্ণাবরণ উন্মোচিত হয়েছে । তাই ঐ মূহুর্ষ মূহুর্তে যদি তাদের বিস্মৃতিও ঘটে তারপরও ওরই কারণে আলাহর ফেরেস্ত াগণ তারতার কর্ণে পৌছে দেবে । কিন্তু মানুষ যদি কালা হয়ে থাকে, সে যদি বারযাখী জগত বা সমাধী কর্ণের অধিকারী না হয়ে তাহলে সে কখনও তালক্বীনের ধ্বনি শুনতে পারে না । তাই তার অবস্থার কোন পরিবর্তনই সাধিত হবে না । যে সকল বিষয়ের প্রতি এখানে ইঙ্গেত করা হয়েছে তা পরিত্র হাদীস সমূহেও বর্ণিত হয়েছে ।

সুমহান প্রভু বলেন ঃ (الرحمنِ الرحيم) জেনে রাখ ঐশর্যময় সুমহান সত্তা, সমস্ত নাম ও গুণাবলী আর্বিভাবে দু'টি স্তর রয়েছে।

প্রথমতঃ নামের স্তর ও সত্তাবাচক গুণাবলী সমুহ যা হযরত আহাদীয়াতে নির্ধারিত আছে। যেহেতু সত্তাগত জ্ঞান, সাত্মিক তাজ্জালি সংক্রান্ত বিষয়বস্তু। (এমনকি) শক্তি ও সাত্মিক ইচ্ছা এবং অন্যান্য সত্তাবাচক বিশেষণও।

দ্বিতীয়তঃ নামের স্থর ও ক্রিয়াবাচক গুণাবলী যা (صفات فعليّه) এর তাজালিতে পরম সত্যের জন্য সুনির্ধারিত রয়েছে। ইশরাখীদের দৃষ্টিতে যেহেতু উপস্থিত বিদ্যা (علم فعلى) অপরিবর্তনীয় ও (علم تفصيلى) বিস্তারিত বিদ্যা ভিত্তিক। শ্রেষ্ঠ হাকীম জনাব খাজা নাসির উদ্দীন,* এ বিষয়ের উপর যুক্তি প্রনয়ণ করেছেন।

এই অর্থে যে, ব্যাপক জ্ঞানের মানদন্ড হল উপস্থিত বিদ্যা। এ ক্ষেত্রে তিনি ইশরাখী মতধারার অনুসরণ করেছেন।

বিষয়টি যদিও গবেষণা বিরোধী বরং ব্যাপক জ্ঞান সত্তার স্তরে নির্ধারিত , তাই কাশফ্ (অর্ন্তদশর্ন) ও সত্তাগত ব্যাপক জ্ঞান উপস্থিত বিদ্যার চেয়ে উন্নততর ও ব্যাপক। এ বিষয়টি নিজস্ব আলোচনার স্থানে আলোর যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত। তবে মুল বিষয় যা উপস্থিত বিদ্যা অস্তিত্বের নিয়ম নীতি, সত্যের ব্যপক [জ্ঞান] ভিত্তিক যা যুক্তি ও ইরফার শাস্ত্রে প্রণতি ও বাস্তবায়িত বিষয়। যদিও এর উচ্চতর পন্থা ও ইরফানী মধুর অমিয় প্রেমের এ সকল পন্থা ব্যতীত অন্য পন্থাও রয়েছে ।–

প্রেমিকের মাজহাব সকল মাজহাব ভিন্ন

মোট কথা (رحمانيّه) ও (رحيميّه) রহমতের দু'টি স্তর ও তাজ্জালি রয়েছে। একটি হযরত আহাদীয়াতের সত্তা (ذات) রুপে (اقدس فيض) তাজালিতে প্রকাশিত, আর অন্যটি (اعيان كنيّه) প্রাথমিক আকার (فيض مقدس) এর তাজ্জালিতে। এ পবিত্র সুরাতে যদি (رحمن) ও (رحيم) সত্তাবাচক গুণাবলী হয় (যা অধিক প্রকাশিত) আর পবিত্র এ আয়াতে (الرحمن بسم الله) ঐদু'টিকে গুণবাচক নামকে (اسم) এর অনুগত বলা চলে। যাতে ক্রিয়াবাচক গুণে পরিণত হয়। সুতরাং এখানে পুর্ণবৃত্তির কোন কথাই উঠতে পারে না। ফলে অনেকে ধারণা করবে যে, বিষয়টি গুরুত্বারোপ ও অধিকান্ত অর্থ বোঝাতে এসেছে। তখন এধারণা (والْعِلمُ عندَ الله) অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এমন হবে যে, الحمدُ لِّذاتِهِ الرحمانِّ و الرّحمانيّة والرحيميّة الرحيمىبمَشيئَتهِ

যেমনটি মাশিয়াতের (مشيّت) অবস্থান পবিত্র সত্তার প্রকাশ স্থান। আর (رحمانيّت) ও (رحيميّت) অবস্থান হল, মাশিয়াতের প্রাথমিক আকার স্থান। তাই (رحمانيّت) ও (رحيميّت) প্রকাশ সত্তাগত । এ ক্ষেত্রে আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে যা বর্ণনা থেকে আমরা এখানে বিরত থাকলাম। কেননা, উলেখিত সম্ভবনাটিও সার্বিক সত্যের নিকটতর।

মহান প্রভুর উক্তি (مالك يوم الدين) বহু সংখ্যক ক্বারী (مالك) শব্দের মিম ফাতাহ যুক্ত ও কাসরা যুক্ত লাম সহকারে পাঠ করেছেন। তারা এ দু'প্রকারের পাঠের ব্যাকারণগত ও সাহিত্যিক কারণাদিও উলেখ করেছেন। এমন কি কোন কোন মহান আলেমগণ (রঃ) (مَلِك) এর উপর (مالك) পাঠে প্রাধান্য প্রমাণে প্রবন্ধও রচনা করেছেন । এ ক্ষেত্রে দু'পক্ষের উলেখিত বিষয়বস্তু থেকে বিশ্বাসযোগ্য কিছু অর্জিত হয় না।

লেখকের দৃষ্টিতে যেটা মনে হয় তাহল, (مالك) –ই প্রাধান্য পাবে বরং এটাই নির্ধারিত। কেননা, পবিত্র এ সুরাটি ও পবিত্র সুরা তাউহীদ কুরআনের অন্য সকল সরার মত নয়। বরং এ সুরাদ্বয় প্রতিটি মুস্তাহাব ও ওয়াজিব নামাজে প্রত্যেককেই পাঠ করে থাকেন। প্রতিটি যুগে কোটি কোটি মুসলমান, কোটি কোটি মুসলমানদের থেকে এ ভাবেই শুনেছেন এবং পাঠ করেছেন। আর তারাও তাদের পূর্বের কোটি কোটি মুলমান তারা যে ভাবে পাঠ করতেন সে ভাবেই শুনে এসেছেন। এখানে অক্ষরের পরিবর্তন বা কোন বির্বতন হয়নি। বিষয়টি সত্য পথের প্রদর্শকগণ ও মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমেও প্রমাণিত। যদিও অধিকাংশ ক্বারীগণ (مَلِك) পাঠ করেন এবং অনেক আলেমগণও (مالك) পাঠে প্রাধান্য দিয়েছেন। এতদসত্তেও এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় যুক্তি ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের নিকট এসে পৌছেনি। কেউই এ মতকে অনুসরণ করেনি। তবে সর্বপরি আলেমগণের নিকট যে কোন (ছয় জনের যে কোন) একজন ক্বারীকে অনুসারণ করা বৈধ। (অবশ্য ব্যতীক্রম মতও রয়েছে তবে তা গুরুত্বহীন) অথচ তারা নিজেরাই নিজদের এ মতকে [যার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন] দৈনিক নামাজের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেননি। আর যদি কেউ পাঠ করেও থাকেন তাহলে সে, সতর্কতা মুলক ভাবেই (مَلِك) পাঠ করেছেন এবং(مالك) কেও পাঠ করার জন্য বলা হয়েছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই বর্ণিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের শেইখ, আলামা হাজ্জ শেইখ আব্দুল কারীম ইয়াজদী সমকালীন অন্যতম একজন আলেমের অনুরোধে (مَلِك) ও পাঠ করতেন। তবে এ জাতিয় সতর্কতা অবলম্বন নিতান্ত দুর্বল যুক্তি ভিত্তিক বিষয়। বরং লেখকের বিশ্বাস অনুযায়ী ভিত্তিহীন বিষয় বৈ কিছু নয়।

উলেখিত বর্ণনা থেকে বিষয়টির দূবলতা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, তারা বলেন ঃ কুফী অক্ষরের (ملك) ও (مالك) শব্দদ্বয় পরস্পর গুলিয়ে গেছে। এ জাতিয় দাবী, যে সকল সুরা অধিক পাঠ হয় না তাদের ক্ষেত্রে হয়তবা ধারণা করা যেতে পারে। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। আর এরকম সুরা যা সবাই [ইসলামের প্রথম যুগ থেকে] পাঠ করে আসছে (বিষয়টি সুস্পষ্ট) যে, কেমন ভিত্তিহীন দাবী, কেমন বুদ্ধিহীন আবেদন।

উলেখিত বিষয়টি (كفواً) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও (ফাতাহ্ সংযুক্ত [واو] ও জাম্মা সংযুক্ত [فاء]) কেবল 'আসেম' পাঠ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। তবুও বিষয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশিদ্ধ এ বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণিত। তাই অন্য পাঠ পদ্ধতি উপস্থাপনের প্রয়োজন এখানে নেই। যদিও কেউ কেউ আপন কল্পনার ভিত্তিতে সতর্কতা মুলক ভাবে অধিকাংশের পঠন পদ্ধতি অনুসারে জাম্মা সংযুক্ত (فاء) ও (واو) পাঠ করেন। তারপরও এ সতর্কতা নিরার্থক ও অহেতুক মাত্র ।

আবার যদি রেওয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী 'নাস' এর পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ করি । [- ওসাইলুশ শীয়া ৪খন্ড ৮২১ নম্বর পৃষ্ঠা, সালাত গ্রন্থ, (আল্ কেরাআতু ফিস্ সালাত অধ্যায়) ৭৪ অধ্যায়, ৩-১ নম্বর হাদীস।] এ নিয়ে বিতর্ক করেন যদিও এখানে বিতর্কের সুযোগ রয়েছে । তবে সম্ভবনা রয়েছে উলেখিত হাদীসের অর্থ হল যেমনটি সাধারণতঃ মানুষেরা পাঠ করে থাকে ,পাঠ কর । ফলে ছয় প্রকারের পাঠ পদ্ধতি থেকে বাছাই করার আর সুযোগ থাকবে না । উদহারণ স্বরুপ এমতাবস্থায় (مَلِك) ও (كفواً) এর পাঠ পদ্ধতি পবিত্র গ্রন্থে লিখিত ও মুসলমানদের মধ্যে প্রশিদ্ধ রুপ ব্যতীত অন্য সকল পদ্ধতি বাতিলে পরিণত হবে । যাইহোক, তাদেরই পাঠ সতর্ক মূলক যারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচালিত পদ্ধতি ও পবিত্র গ্রন্থে লিখিত রুপের অনুসরণ করে । কেননা, এজাতিয় পাঠ প্রতিটি পদ্ধতিতেই সঠিক সাব্যস্ত করা হয়েছে । আলাহই ভালো জানেন ।

নির্দেশ মুলক গবেষণা ঃ

জেনে রাখ! মহান প্রভুর মালিকত্ব তাঁর বান্দারা যেভাবে দ্রব্যাদির মালিক হয় অনুরুপ নয়। রাজা-বাদশাদের আয়ত্বে বিদ্যমান দ্রব্যাদিসমও নয়। কেননা, এগুলো সবই আপেক্ষিক ও ক্ষণস্থায়ী। অথচ সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক এমনটি নয়। যদিও বিষয়টি ফেকাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শী আলেমদের নিকট মহান প্রভুর ক্ষেত্রে এ জাতিয় মালিকত্ব লব্দক * ভাবে প্রজোয্য। তবে উলেখিত দৃষ্টি ভঙ্গীতে বর্ণিত বিষয়ের সাথে কোন সংঘর্ষ নেই। যাহোক প্রতিটির অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্ষেত্রে তার যে মালিকত্ব এ রকমও নয় এবং তার অভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক শক্তি সমুহের মালিকত্ব স্বরুপও নয়। যদিও এ মালিকত্বটি মহান সত্যের মালিকত্বের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্য সকল মালিকত্ব থেকে নিকটতর।

উদহারণ স্বরুপ নাফসের ক্ষেত্রে নিজের সত্তাবাচক ক্রিয়ার মালিকত্ব, যা নাফসানিয়াত মুলক। যেমন কল্পিত রুপ সৃষ্টি, যার পরিব্যাপ্ততা, ও সংকীর্ণতার শক্তি অনেকখানি নাফসের আয়ত্বাধীন। আবার আয়ত্বাধীনও নয়, বুৎপত্তিক বিশ্ব সমুহের মালিকত্ব বর্হিভুত বিশ্বেরও নয়। যদিও তারা এ সকল বিশ্বের অস্তিত্ব উদ্ভব ও বিনাশ ক্ষেত্রে ভুমিকা রেখেও থাকে। কেননা, সম্ভবনাময় উদ্ভুত সকল কিছু যা, উলেখিত বিষয়ের প্রতিচ্ছায়ায় অতি তিক্ষ্ণ প্রতিবিম্ব। তারা ভাগ্যের সীমানায় পরিসীমিত আপন ভাগ্যে। তাই সে ভাগ্য আবারণের পরিধিতে হলেও। আর যা কিছু কোন না কোন সীমানায় পরিসীমিত। সুতরাং সমস্ত কিছু আপন সত্তার স্তরের পেক্ষাপটে তার পরিগ্রহ ক্ষমতার সাথে পরস্পর পরস্পর বিরোধপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করছে । এ দিক থেকে ভিত্তি স্বরুপ সত্তাগত পরিব্যাপ্ততার তার অধিকারী নয়।

তবে মহান সত্যের আধিপত্যে যা (اضافه اشاقيّه) মাধ্যমে (احاطه قيّوميّه) ভিত্তি মূলক পরিবৃত করে আছেন । এ সত্তাগত আধিপত্য পরম সত্যের সত্যতা (مالكيت ذاتيّه حقيقيّه حقّه) যেখানে সত্তায়, গুণাবলীতে কিংবা অস্তিত্ব জগতের কোন অস্তিত্বে কোন প্রকার অনন্তমুলক বৈপরীত্যের সম্ভবনা নেই। একই ভাবে ঐ পরম সত্য সত্তার আধিপত্য (ذات مقدس مالكيت) সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ ও সমান ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ আধিপত্যে অস্তিত্ব জগতের কোন অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কমবেশী বা অসমতা অথবা অন্য বিশ্য থেকে অদৃশ্য জগত ও অদৃশ্য অস্তিত্ব সকল অধিক নৈকট্য সম্পন্ন হওয়া কিংবা আধিপত্য দ্বারা সর্বাধিক পরিবৃত্তও নয়। কেননা, এমনটি হলে অনন্তের ও অসীমত্ব , পরিধি বা সসীমত্বের প্রয়োজন পড়বে। ফলে মহান সত্তা একটি সম্ভবনামুলক সত্তায় পরিণত হবে। মহান আলাহ এসকল কিছু থেকে বিশুদ্ধ ও মুক্ত । মহান প্রভুর এ পবিত্র উক্তিটি হয়তবা এ বিষয়ের প্রতিই নির্দেশ বহন করে।

১. مِنْكُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ

আমরা তোমাদের থেকে তোমাদের সর্বাধিক নিকটে অবস্থান করছি ।

-সুরা ওয়াকীয়া ৮৫ নম্বর আয়াত ।

২. مِنْ حَبْلِ الوَرِيد نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ

আমরা তার কণ্ঠাদেশের ধমনীর চেয়েও অধিক নিকটবর্তী ।

-সুরা ক্বাফ ১৬ নম্বর আয়াত ।

৩. وَالأَرْض و اللهُ نُورُ السَّمواتِ

আলাহ আসমান ও জামিন সমূহের জ্যোর্তি

-সুরা নুর ৩৫ নম্বর আয়াত ।

৪. السَّماءِ إِلهٌ وَ فِى الأَرضِ إِلهٌ وِ هُوَ الَّذى فِى

তিনিই আসমান ও জমিন সমূহের প্রভু

–সুরা যুখরুফ ৮৪ নম্বর আয়াত ।

৫. وَالأَرْض وَلَهُ مُلْكُ السَّمواتِ

আসমান ও জামিন সমূহের আধিপত্য একমাত্র তাঁরই

-সুরা রবাকারা ১০৭ নম্বর আয়াত ।

যেমনটি মহানবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ بِحَبْلٍ إِلى الاَرْضَيْنَ السُّفْلى لَهَبَطْتُم عَلى اللهِ لَوْدُلِّيتُمْ

তোমরা যদি একটি দড়ি ধরে ভূপৃষ্ঠের তলদেশ অভিমুখে রওনা হও , তবুও প্রভুর প্রতিই অবনামিত হবে।

আল ইলমুল ইয়াক্বীন ১খন্ড ৫৪ নম্বর পৃষ্ঠা, ‘মুকাদ্দামেই কাইসারী’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েও সামান্য পার্থক্যে উলেখিত হয়েছে।

আল্ ক্বাফীর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ فَلاَ يَخْلُومِنْهُ مَكانٌ وَ لا يَشْتَغِلُ بِهِ إِلى مَكانِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلى مَكانِ مَكانٌ وَ لا يكُونُ

কোন স্থান (মহান সত্তার) উপস্থিতি শুন্য নয়। আবার কোন স্থান তাঁকে পরিবৃত করে রাখেনি। একই ভাবে (তাঁর নিকট) কোন স্থান অন্য কোন স্থান থেকে অধিক নিকটতর নয়।

উসুল আল্ ক্বাফী, ১ম খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা। কিতাব আত্ তাউহীদ, আল্ হারাকাত ও আল্ ইন্তেকাল, অধ্যায়ের ৩ নম্বর হাদীস।

অন্যত্র ইমাম আলী নাকী (আঃ) বলেন ঃ فى السَّماءِ الدُّنْيا فَهُوَ كَما هُوَ عَلى وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذا كانَ لَهُ سَواءُ عِلماً وَ قُدْرَةً وَ مُلكاً وَإحاطَةً العَرْشِ .وَ الأَشياءُ كُلُّها

জেনে রাখ ! তিনি যখন আসমানে ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করেন ঠিক একই ভাবেই আরশেও অবস্থান করেন। তাঁর শক্তি জ্ঞান আধিপত্য ও পরিবৃত্তের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুই সমভাবে অবস্থান করে।

উপরের দ্রষ্টব্য।

যদিও পবিত্র সত্তার আধিপত্যতা সকল অস্তিত্ব ও সমগ্র বিশ্বে সমভাবে বিরাজ করছে। তারপরও পবিত্র আয়াতে বলা হচ্ছে (مالك يوم الدين) এখানে নির্ধারিত ভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ (يوم الدين) হল সমাবেত দিবস । এ দিক থেকে আধিপত্য (يوم الدين) যা সমাবেত দিবস। অন্য সকল বিচ্ছিন্ন দিবসেরও মালিক। বস্তু জগতের বিচ্ছিন্ন সমস্ত স্তর, মালাকুতের স্তরে সমাবেত।

অথবা এ জন্য যে, মহান সত্তার কাহারিয়াত ও আধিপত্যে প্রকাশ সমাবেত দিনে, যে দিবসে সম্ভব্য অস্তিত্বরা আলাহর দরবারে ও আলাহতে বিলনি হবে।

এ সংক্ষিপ্ত পরিসরের পুস্তিকায় ঐ বিশাল বিষয়ের যতখানি সংক্ষেপে বর্ণনা করা সম্ভব, তাহল যতক্ষণ অস্তিত্বের আলোকধারা সত্যের স্বর্নাল সূর্য অবতরণ মূলক যাত্রায় এবং চরম অদৃশ্য ভুবন থেকে প্রকাম্য জগতে আগমন বিষয়টি [প্রকৃত] আধার ও অদৃশ্যমুখীসম।

অন্যকথায় প্রতিটি অবতরণ স্তরের একটি বিশেষ আকার বা রুপ পরিগ্রহ করে। আর প্রতিটি রুপ বা আকার কোন না, কোন আবারণের পরিধিতে পরিবেষ্টিত। আবার যেহেতু মানব প্রকৃতি [মানুষ] সকল প্রকার রুপ ও পরিধির সমষ্টি , তাই সে পরিবৃত সপ্ত আধারাচ্ছন্ন আবারণ এবং সাতটি আলোক আবারণের সবকটি দ্বারা । 'তাউইল' অনুযায়ী ঐ সপ্ত আধারাচ্ছন্ন আবারণ হল সপ্ত ভূপৃষ্ঠ আর সপ্ত আলোক আবারণ হল, সপ্ত আসমান । হয়ত সর্ব নিম্ন স্তরে (اسفل السّافلين) নিক্ষেপের অর্থ হল, সকল প্রকার আবারণে পরিবৃত হওয়া । আর এ সূয্যের অস্তিত্বের আবারণ ও বিশুদ্ধ আলোক , রুপের আসমানে, রজনী (ليل) ও (ليلة القدر) পরিভাসায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । [সুতরাং] যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ আবারণে আবৃত থাকবে ততক্ষণ , অনন্ত ঐ সৌনন্দ্য প্রত্যক্ষে এবং প্রথম নুরের আকৃতির অন্তারলে পরিবৃত । অতএব আরোহণ মুলক গতিতে প্রতিটি অস্তিত্ব সৃষ্টি জগতের সর্বনিম্ন স্তর প্রকৃতি থেকে প্রাপ্রকৃতি গতিতে (যা তাদের সত্তার পাহাড়ে ঐশী সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণে পরিমান অনুযায়ী [علميّه حضرت] হযরত জ্ঞাতকে আমানত স্বরুপ উপস্থাপন করা হয়েছে ।) । তা আপনার প্রকৃত জন্ম ভুমি ও উৎপত্তি স্থানে প্রত্যাবর্তন করে । এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের আয়াতে সর্বাধিক নির্দেশ বহন করে । দ্বিতীয়বারে আলো ও আধারের আবারণ মুক্ত বা পরিশুদ্ধ হয়ে মহান সত্যের আধিপত্য ও ঐশয্য (مالكيت و قاهريّت) দ্বারা প্রকাশিত হবে এবং সত্যের একচ্ছত্র আধিপত্যে (وحدت و قهاريّت تجلّى) তাজালি ঘটবে। এ অবস্থানে যেহেতু সমপ্তির প্রত্যাবর্তন শুরুতে ও প্রকাশিত বিশ্ব ও অপ্রকাশিত বিশ্বের (آخر به اول و اتّصال ظاهر به باطن) সংযোগ ঘটে এবং দৃশ্যিত বিধানের শাসনের পতন ঘটে (باطن حكم ظهور ساقط و حكومت) বাতেনী শাসনের প্রকাশ লাভ করবে । তখন সামগ্রিক হযরত অধিকর্তার (حضرت مالك) পক্ষ থেকে সম্মোধন করা হবে এবং মহান বিশুদ্ধ সত্তা ব্যতীত এ সম্মোধনের কোন সম্মোধিত পক্ষ থাকবে না । اليَوم لِمَن المُلكُআজকের আধিপত্য কার ? যেহেতু উত্তর দেওয়ার কেউ নেই তাই নিজেই বলবেন ঃ لله الواحدِ القهّار একক আলাহর আধিপত্য। সুরা গাফির ১৬ নম্বর আয়াত।

এ সামগ্রিক দিবসে সত্যের স্বর্ণ সূর্য রুপের জগত থেকে বর্হিভূত হওয়ার দিন একত্রে (يومدين)। কেননা, প্রতিটি অস্তিত্বই নিজের যথাযোগ্য নামের প্রতিচ্ছায়ায় (فانى درحق) পরম সত্যে বিলীন হবে। আর যখনই শিংগায় ফুক দিবেন ঐ নাম প্রকাশ পাবে এবং উক্ত নামের ছত্রতলে একত্রে অবস্থান করবে। فَريقٌ فى الجَنَّةِ وَ فَريقٌ فى السَّعير–একদল বেহেস্তে ও আরেক দল (জাহান্নামের) আগুনে ।
– সুরা শুরা ৭নম্বর আয়াত।

পূর্ণ মানব সত্তা এ জগতে প্রভুর প্রতি তার যাত্রানুপাতে বা প্রত্যার্বন অনুযায়ী সে আবারণ মুক্ত হয়ে থাকেন । কেয়ামতের বিধি-বিধান ও মূহুর্ত এবং বিচার দিবস তার নিকট প্রকাশ পাবে ও গৃথিত হয়ে যাবে । অতঃপর পরম সত্য তার অন্তরে আপন আধিপত্যে প্রকাশ লাভ করবে । নামাজের মি'রাজ ক্ষেত্রে তার ভাষ্য অন্তরকেই অনুবাদ করবে এবং অন্তরে উপলব্ধিও প্রত্যক্ষের ভাষ্যে তার বাহ্যিক রুপ প্রকাশ পাবে । এটা হল (يوم الدين) এর বিশেষ একটি রহস্য ।

আরশীয় প্রত্যাদেশ ঃ

জেনে রাখ! যে (عرش) আরশের অর্থ ও বাহকদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত বিরাজ করছে । পবিত্র হাদীস সমুহে বাহ্যিক ভাবে বিরোধ থাকলেও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই । তবে দার্শনিক পন্থায় ও ইরফানী দৃষ্টিতে (عرش) বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যার একটি হল, [অন্য কোন শ্রেণীর ভাষাতে দেখিনি] হযরত (واحديّت) যা (فيض اقدس) এর উপর দন্ডায়মান । আর আরশকে বহন করছে নাম সমুহের চারটি মুল নাম যথাক্রমে ঃ (১) প্রথম [اول] (২) পরিসমপ্তি [آخر] (৩) প্রকাশ [ظاهر] (৪) অন্তর [باطن] । আরেকটি ব্যাখ্যানুযায়ী [এটা্ও কোন শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিনি] (فيض مقدّس) এর উপর উপর ভর কওে আছে মহান নাম এবং এ নামের বাহক যথাক্রমে ঃ রহমান , রাহীম, রব্ব, ও মালিক । বিষয়টির আরও একটি ব্যাখ্যা হল, [ماسوى الله] বাক্যটি যাকে বহন করছে চারজন বিশিষ্ট ফেরেস্তা যথাক্রমে ঃ ইস্রাফিল, জিব্রাইল, মিকাইল, ও আজ্রাইল (আঃ) ।

আরও একটি ব্যাক্যা হল, সার্বিক বস্তু (جسم كلّ) যাকে বহন করছে চারজন ফেরেস্তা , যার রুপ হল প্রকারের প্রতিভু (انواع ارباب) আল কাফী গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।

– উসুল আল্ কাফী ১ম খন্ড ১২৯-১৩৩ নম্বর পৃষ্ঠা ।

‘কিতাব আত্ তাউহীদ গ্রন্থের আরশ ও কুরসী অধ্যায়। আবার কখনও কখনও জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গেত করা হয়েছে । অবশ্য এখানে জ্ঞান বলতে হয়ত (علم فعلى) বৃহৎ কতৃত্বের অবস্থান ক্ষেত্রে মহান সত্যের উপস্থিত জ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। আর বাহকগণ হলেন চারজন বিশিষ্ট অতীত জাতি সমুহের পূর্ণ আওলিয়াগণ নুহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা (আঃ) এবং এ জাতির চারজন বিশিষ্ট পরিপূর্ণ সত্তার ব্যক্তিগণ হলেন ঃ রাসুল (সঃ) আমিরুল মুমিনীন , আল্ হাসান ও আল্ হুসাইন (আঃ) ।

উলেখিত ভুমিকাটি জানার পর, এখন জেনে রাখ! পবিত্র সুরা হামদে আলাহ নাম , যে নাম সত্তার প্রতি নির্দেশ করে তা উলেখের পর এই চারটি পবিত্র নাম প্রতিপালক (ربّ) পরম দয়ালু (رحمن) দয়ালু (رحيم) ও মালিক (مالك) পাঠের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে । সম্ভবতঃ এ জন্যেই যে, এ চারটি পবিত্র নাম (واحدنيّت) আরশের বাহক (বাতেন অনুযায়ী) আর এদের বাহ্যিক রুপ সত্যের চারজন বিশিষ্ট ফেরেস্তা আছেন যারা আরশকে বহন করছে ।

অতএব পবিত্র নাম প্রতিপালক (ربّ) হল , (মিকাইল) এর অন্তর যে, আহার্য নির্বাহের দায়িত্ব বহন করছে এবং অস্তিত্ব জগতের প্রতিপালকের প্রকাশিত রুপ। আর পবিত্র নাম (رحمن) হল , ইস্রাফিলের অন্তরসম যে আত্মা সমুহের ও শিংগায় ফুক দেওয়ার অধিকর্তা এবং আত্মা ও আকৃতি সমুহ কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। একই ভাবে অস্তিত্ব সমুহকে সংকুচ্রীত করে থাকেন)। আর পবিত্র নাম, অন্যদিকে পবিত্র নাম (رحيم) হল , জিব্রাইলের অন্তরসম যিনি অস্তিত্ব সমুহের পূর্ণতা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর পবিত্র নাম (مالك) হল আজ্রাইলের অন্তরসম যিতি আত্মা ও রুপ সমুহকে কবজ ও বহিরকে অন্তরে প্রত্যার্বতন করানোর দায়িত্বে নিয়েজিত আছেন। অতএব পবিত্র সুরার (مالكِ يَومِ الدِّين) পর্যন্ত (واحدنيّت و عرش تحقق عرش) একত্বতা ও স্থায়ী আরশ ও তার বাহকদের প্রতি নির্দেশ বহন করছে। তাই অস্তিত্ব জগতের পূর্ণ বন্ধনী এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যের তাজালী, যার অনুবাদ বা প্রতি রুপ হল পবিত্র কুরআন শরীফ ।

এ পর্যন্ত এই সুরাতে উলেখিত [বিষয় বস্তু সমুহের সমষ্টি] হল। একই অর্থের সমষ্টি (بسم الله) বিসমিলাহ্ তে [যে নাম মহান নাম] বিদ্যমান। আর বিসমিলাহর ‘ব’ অক্ষরটি যা হেতু মূলক অবস্থান স্বরুপ এবং ‘ব’ অক্ষরের নিম্নের নোকতাটি হেতুর রহস্য মূলক এর মধ্যে বিদ্যমান। ইমাম আলী

(আঃ) হলেন, বেলায়াতের রহস্য ও হেতু । সুতরাং তিনিই হলেন 'ব' অক্ষরের নিম্নের নোকতা। অর্থাৎ 'ব' এর নীচের নোকতাটি বেলায়াতের ও রহস্যের প্রতিবিম্ব । গভীর মননিবেশ, গভীর মনযোগে অযথ সমস্যা আছে যা হাদীসে বিদ্যমান । আলাহই ভাল জানেন ।

ইরফানী টিকা ঃ

(ربّ) ও (رحمن) শব্দদ্বয়ের পূর্বে (رحيم) শব্দ এবং (مالك) শব্দটি সবশেষে উলেখের মধ্যে হয়তবা একটি রহস্যময় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গেত করা হয়েছে । যা হচ্ছে , মানুষের যাত্রা পদ্ধতি এই বস্তু জগত পৃথিবী থেকে পূর্ণ বিলীনত্ব পর্যন্ত বা সমস্ত কিছুর মালিকের সম্মুখে উপস্থিতির স্থর পর্যন্ত , তাই পথিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত যাত্রার প্রথম স্থরে আছে, ততক্ষণ সে (ربّ العالمين) এর ক্রমশঃ প্রতিপালনের ছত্রতলে অবস্থান করছে । কেননা , তখনও সে একজন এ বিশ্বেরই এক জন এবং যাত্রা ও কালের শাসনাধীনে ও ক্রমানুপাতে প্রতিপালিত । তাই যখনই সে যাত্রার কদম প্রকৃতি জগতের বাইরে রাখবে বা এ বস্তু জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে । পরিবৃত নাম সমূহের স্থর যা কেবল বিশ্বের সাথেই সংশিষ্ট নয় তা তার অন্তরে প্রকাশিত হবে। অন্যদিকে যেহেতু পবিত্র নাম (رحمن) অন্য সকল নাম সমূহের মধ্যে অধিক পরিব্যাপ্ত সে নামই উলেখ করা হয়েছে । আবার যেহেতু (رحمن) রহমতের আর্বিভাব ও পূর্ণ উন্মোচনের স্থর (رحمن) এর আছে উলেখিত হয়েছে যা বাতেনের অধিক নিকটাবর্তী । এজন্যেই (رحيم) এর পূর্বে অবস্থান নিয়েছে ।

সুতরাং ইরফানী যাত্রায় প্রথমে প্রকাশিত (ظاهره) নাম সমূহ আর্বিভুত হয় । তার পর , অপ্রকাশিত (باطنه) নাম সমূহ , কেননা, পথিকের যাত্রা হল , (الكثرة الى الوحده) বহুত্বতা অসংখ্য থেকে এককের দিকে । তাই এ যাত্রার পরিসমপ্তি ঘটবে বিশুদ্ধ অপ্রকাশিত যেয়ে, যাদের একটি নাম হল (مالك) । অতএব মালিক্বয়াত –এ আর্বিভূত হওয়ার মাধ্যমে অসংখ্য অদৃশ্য ও দৃশ্য জগতের পূর্ণ বিলীন হয়ে পরিপূর্ণ উপস্থিতির সৃষ্টি হবে । যখন সে বহুত্বের আবারণ থেকে যাত্রা করে একত্বতায় আর্বিভূত হবে এবং ঐশী আধিপত্যে বিশুদ্ধ হবে ও উপস্থিত ভাবে প্রত্যক্ষের সৌভাগ্য লাভ করবে তখনই সে উপস্থিত সম্মোধনে إيَّاكَ نعبد বলবে।

অতএব পথিকদের যাত্রার পূর্ণ বন্ধনী পবিত্র সুরাতে উলেখিত হয়েছে, প্রকৃতি জগতের সর্বশেষ আবারণ থেকে আধাঁর ও আলোকের সমস্ত আবারণ অপসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ উপস্থিতির স্থরে উন্নীত হওয়া পর্যন্ত । আর এ উপস্থিতি পথিকের বৃহৎ কেয়ামত ও এটাই তার সুর্নিধারিত কাল । হয়তবা এই পবিত্র আয়াতে

فَصَعِقَ مِنْ السّموات وَ مَنْ فِي الأَرض إلا مَنْ شاءَ الله জামিন ও আসমান সমূহে যা কিছু আছে সবই নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আলাহ ইচ্ছা করবেন । – সুরা যুমার ৬৮ নম্বর আ্যয়াত ।

ব্যতীক্রমশীল ব্যক্তিগণ হলেন, উলেখিত পথিকগণ । যারা কেয়ামতের শিংজ্ঞায় পূর্ণ ফুক দেওয়ার পূর্বেই তাদের বিলীনত্ব ও পতন (صعق و محو) এর স্থর অর্জন করেছেন । একই ভাবে মহানবী (সঃ) এর এ উক্তির একটি সম্ভবনা হল, তিনি বলেন ঃ اَنَا وَ السّاعَةُ كَهاتَيْن আমি ও কেয়ামত এ দু'টির [আঙ্গুল] ন্যায় ।

তিনি নিজের দুটি পবিত্র সাক্ষ্য আঙ্গুল সমন্নয় করে বলেন , এই একই অর্থে ।

সাহিত্যক টিকা ঃ

প্রচালিত তফসির গ্রন্থে যেমনটি আমারা দেখেছি , বা তাদের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তারা দ্বীন শব্দটিকে প্রতিদান ও হিসেব অর্থে ধরেছেন । অভিধান গ্রন্থ সমূহের একই অর্থে উলেখিত হয়েছে । তারা আবার কবিদের কাব্যকে দলিল বা ভিত্তি স্বরুপ উপস্থাপন করেছেন । যেমন কবির ভাষ্যে وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ ما تَدَينُ تُدانُ অর্থাৎ জেনে রাখ যেভাবে শাস্তি দিবে ঠিক সেভাবেই দেওয়া হবে ।

আরো একটি উক্তি যা কথিত আছে সাহল বিন রাবিয়ার উক্তি স্বরুপ . لَمْ يَبْقَ سِوَى العُدْوان وَ دِنَّاهُم كَما دانوُا ز শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না, তাদের প্রতিদান অনুরুপ বিচার করেছি । – সাহল বিন শাইবান, জামেউশ শাবাহেদ, 'আল ফা বাদাল লাম' অধ্যায়, ২১৬ পৃঃ ।

তারা বলেন ঃ (ديّان) যা প্রভুর একটি নাম , তার অর্থও একই । সম্ভবত (دين) শব্দের উদ্দেশ্য হল, বিশুদ্ধ শরীয়ত । কেননা, কেয়ামতের দিন দ্বীনের প্রভাব আর্বিভুত হবে এবং দ্বীনের রহস্য ও বাস্ত বতা আবারণ বা পর্দা থেকে প্রকাশ্যে এসে পতিত হবে । এ জন্যে ঐ দিনকে দ্বীনের দিবস বলা উচিত। যেমনী ভাবে আজ হল পৃথিবীর দিবস। কেননা, দুনিয়ার প্রভাব আজ প্রকাশিত। এ বিষয়টি মহান প্রভুর ভাষ্যেরই মত, তিনি বলেন ঃ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله প্রভুর দিন গুলোকে তাদের স্মরণ করিয়ে দাও।

– সুরা আল ইব্রাহীম ২ নম্বর আয়াত ।

সেটা এমন একদিন যে দিন মহান সত্য তার আধিপত্য ও ঐশয্য ও শক্তি দ্বারা সবার সাথে আচারণ করবেন । কেয়ামত দিবসও আলাহর দিবস এবং এটাও দ্বীনের দিবস । কেননা, এদিন মহান প্রভুর কতৃত্ব এবং আলাহ্ সত্য দ্বীন প্রকাশিত হবে ।

মহান প্রভুর ভাষ্যে إياك نعبد و إياك نستعين জেনে রাখ! ওহে প্রিয় , যখন কোন পথিক মারেফতের পথে সকল গুণকীর্তন ও প্রসংশা এক মাত্র পূতঃপবিত্র সত্য সত্তার জন্যে নির্ধারিত বলে বিশ্বাস করবে । সে আরও বিশ্বাস করবে , অস্তিত্বের পরিবর্ধন ও সংকোচন [জীবন ও মরণ] এক মাত্র তাঁরই হাতে এবং সৃষ্টির প্রথম ও শেষ , শুরু ও সমপ্তির সমস্ত কতৃত্ব তাঁরই আধিপত্যের হাতে । এর পর যখন তার অন্তরে সাত্তিক ক্রিয়া বাচক তাওহীদ তার অন্তরে প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে, উপাসনা ও সাহায্য প্রর্থনাকে একমাত্র পরম সত্যের জন্য নির্ধারিত করবে। একই সাথে অস্তিত্ব জগতের সব কিছুকেই স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্যকতায় প্রভুর পবিত্র সত্তার প্রতি অবনত দেখবে এবং সে সমগ্র অস্তিত্ব জগতে এমন কোন শক্তি প্রত্যক্ষ করবে না, যারা সহানুভুতি প্রার্থনায় আত্ম নিবন্ধ করবে। অনেকে (اهل ظاهر) যে কথাটি বলেছেন যে, এখানে ইবাদতের ক্ষেত্রে গন্ডিটি বস্তুনিষ্ঠ সত্য গন্ডি তবে সাহায্যের ক্ষেত্রে গন্ডিটি সত্য নয় । কেননা সত্য (প্রভু) ছাড়াও অন্যদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়ে থাকে । পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে ঃ وَ تَعاوَنوُا عَلَى البِرِّ التَّقوى সৎকর্মে ও তাকওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর ।

– সুরা আল মায়েদা ২ নম্বর আয়াত ।

আরো বলেন ঃ إِسْتَعِينوُا بِالصَّبْرِ وَالصَّلوةِ নামাজ ও ধৈয্য অবলম্বনের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর ।

– সুরা আল্ বাকেরা ৪৫ নম্বর আয়াত

নবী (সঃ) ও তার মনোনীত ইমামগণ এবং সাহাবী ও সকল মুসলমানদের জীবন চরিতেও তারা অন্যের কাছে সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন । এ জাতিয় সাহায্য অধিকাংশ ক্ষেঃসত্রে মুবাহ যেমন ,

খাদ্য, কাজের লোক, স্ত্রী, বন্ধু, রাসুল, মজুর, ইত্যাদি । উলেখিত বক্তব্যটি হল (اهل ظاهر) জহেরী আলেমদের দৃষ্টি ভঙ্গী ।

তবে যারা মহান প্রভুর ক্রিয়া বাচক একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং অস্তিত্ব জগতকে মহান প্রভুর কর্তাবাচক রুপ স্বরুপ প্রত্যক্ষ করবে। অস্তিত্ব জগতে তিনি ব্যতীত অন্যের কোন প্রকার প্রভাব শুন্যতাকে যে যুক্তি স্বচক্ষে অবলোকন করবে । তারা বিচক্ষণতা দৃষ্টি ও আলোকমত অন্তঃকরণে সাহায্যের গন্ডিকেও একটি বাস্তব ও সত্য গন্ডি স্বরুপ দেখবে এবং অন্য সকল অস্তিত্বের সাহায্যকে মহান প্রভুর সাহায্য রুপে। এ জাতিয় ব্যক্তিদের ভাষ্য অনুযায়ী। প্রসংশাও কেবল প্রভুর জন্য নির্ধারণ করা ঠিক নয় । এদের পন্থানুযায়ী, তারা অন্য অস্তিত্বের জন্য স্বাধীনতা, সৃষ্টি শক্তি , সৌন্দয্য, ঐশর্য্যের অধিকারী বলে বিষৰাস করে । তাই তারা, গুণকীর্তন ও প্রসংশা যোগ্য । শুধু তাই নয় , জীবন মরণ ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও স্রষ্টার যৌথ উপস্থিতি রয়েছে। এ জাতিয় বিশ্বাস আরেফগণের নিকট শির্‌ক মিশ্রিত বিশ্বাস । আমাদের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এ জাতিয় বিশ্বাসকে গোপন ‘শির্‌ক’ এর পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে । উদহারণ স্বরুপ – কিছু স্মরণ রাখার জন্য আংটি ঘুরানোও, গোপন শির্‌ক হিসেবে পরিগণনা করা হয়েছে ।

মা’আনী আল্‌ আখবার ৩৭৯ পৃ ঃ [নাওয়াদিরুল মা‘আনী অধ্যায়] প্রথম হাদীস । বিহারুল আনওয়ার ৬৯ খন্ড ৯৬ পৃঃ । ‘ঈমান ও কুফর গ্রন্থ’ মুসওয়াবী আল্‌ আখলাখ অথ্যায় ৯ নম্বর হাদীস ।

বিশেষ করে (إياك نعبد و إياك نستعين) বাক্যটি আল্‌ হামদুলিলাহের (الحمدلله) একাংশ বিশেষ যা বিশুদ্ধ তাওহীদের প্রতি ঈঙ্গেত বহন করছে । তাই যার অন্তর এখনও বিশুদ্ধ তাওহীদ উদিত হয়নি এবং আপন অন্তরকে সকল প্রকার শিরক্‌ থেকে বিশুদ্ধ করেনি তার ‘ইয়াকানাবুদু’ (نعبد إياك) সত্য নয় । সে কখনও উপাসনা ও সাহয্যের গন্ডিকে প্রভু কেন্দ্রিক করতে সক্ষম হবে না । সে কখনও প্রভু পত্যশী ও প্রভু প্রত্যক্ষী হতে পারবে না । যখন অন্তরে তাওহীদ উদিত হবে , উদয়ের পরিধি অনুযায়ী অস্তিত্ব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশুদ্ধ মহান সত্তার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হবে । এ ভাবে সে আরো অগ্রসর হয়ে প্রত্যক্ষ করবে আলাহ্‌ নামে (إياك نعبد و إياك نستعين) প্রতিপন্ন হবে এবং একথার (أَنتَ كَما أَثْنَيتَ على نَفسِكَ অর্থ ঃ তুমি অমনই যেভাবে নিজের প্রসংশা করেছো) এর কিছু রহস্য তার অন্তরে বিকশিত হবে ।

ইশরাখী টিকা ঃ

এ গ্রন্থের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা গেছে যে, বচন ভঙ্গীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বচন হতে প্রথম বচনে প্রত্যার্বন ঘেটেছে। এ জাতিয় ব্যবহার যদিও ভাষার একটি সৌন্দয্য এবং ব্যাকারণের অলংকার বৃদ্ধি করে । ভাষার সাবলিলতা, অসররতা দূরীকরণে ভাষার সৌন্দয্য বৃদ্ধি করে । স্বয়ং্‌ এক অবস্থা থেকে অন্য আরেক অবস্থায় বিবর্তন শ্রোতাদের অমনযোগকে দুর করে দেয় এবং তার মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে ।

তাই নামাজ যেহেতু মি’রাজ সমতুল্য ও মহামান্য ‘কুদস’ পুতঃপবিত্র স্থানের সাথে সম্পৃতাক্ত হওয়া এবং (مقام انس) অনুরাহের অবস্থান অর্জন করা । আত্মিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক যাত্রার পথ নির্দেশনা সবই এ পবিত্র সুরাতে দেওয়া হয়েছে । বান্দা যেহেতু তার প্রভুর প্রতি যাত্রার শুরুতে প্রকৃতি জগতের আধাঁরে পরিবৃত এবং অদৃশ্য ভুবনের আলোকে বন্দি ও আচ্ছাদিত । আর অন্যদিকে মহান আলাহর প্রতি যাত্রার অর্থ সকল প্রকার আবারণ হতে আধ্যাত্মিক যাত্রার পায়ে বর্হিভুত হওয়া । প্রকৃত পক্ষে আলাহর প্রতি হিজরত বা প্রত্যাবর্তন হল, ব্যক্তি ও সৃষ্টির আলায় হতে আলাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। বহুত্ব [كثرت] ও অনন্যতার ধুলো ত্যাগ করে একত্বতা অর্জন ও সৃষ্টির ওপারে

মহানদরবারে উপস্থিত হওয়া । সে পবিত্র এ আয়াতের (مالك يوم الدين) আলোকে বহুত্বকে আপন মালিকিয়াত ও কাহারিয়াতের ছত্রতলে একচ্ছত্র ভাবে প্রত্যক্ষ করবে । বহুত্বের অবস্থানকে বিনাশ সাধন করলে, তার হযরতে উপস্থির ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে । তখন সে তার উপস্থিতি মূলক সম্মোধনে এবং ঐশয্য ও সৌন্দয্য প্রত্যক্ষ করে আপন উপাসনাকে উৎস্বর্গ [করতে সক্ষম হবে] করবে। এভাবে সে আপনার খোদা প্রার্থী ও খোদা প্রত্যক্ষীবোধকে বিশুদ্ধ ও অনুরাগের আসরে উপণীত করতে পারবে ।

এখানে (اِيَّاكَ) সর্বনামে হয়ত বিশেষ একটি লক্ষ্যের প্রতি নির্দেশ করছে । হয়ত বা এ জন্যেই যে, এ সর্বনামটি এমন এক সত্তার নির্দেশ বহন করে, যেখানে বহুত্বে বিনাশ ঘটেছে । সুতরাং এ স্থরে সম্ভবনা রয়েছে পথিকের জন্য সাত্তিক তৌহিদের অবস্থা সংঘটিত হবে । একাধিক নাম ও বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, হযরত সত্তার অন্তরের আকৃতি অনাবৃত বহুত্বে পরিনত হবে । আর এটা হল সেই তৌহিদ যা, একত্ববাদীদের ইমাম, দরবেশ ও আরেফগণের সিলসিলার উৎস মূল, এবং প্রেমিকদের প্রতিনিধি, অনুরাগী ও আসক্তদের সিলসিলার শিরমণি , আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) এবং তাঁর নিষ্পাপ সন্তানগণ বলেন ঃ وَ كَمالُ التَّوحيدِ نَفْىُ الصِّفَاتِ عَنْه

তৌহিদের পরিপূর্ণতা হল, [ ] তাঁর গুণাবলী সমূহকে তার থেকে নেতিবাচক বিচ্ছেদ ঘঁটানো ।

– উসুল আল্ ক্বাফী, ১ম খন্ড ১৪০ নম্বর পৃষ্ঠা, তাওহীদ গ্রন্থ ৬ নম্বর হাদীস ।

কেননা, গুণাবলীর একটা ভিন্নতাবোধ বা পরিসংখ্যানগত বহুত্ব রয়েছে । আর এ বহুত্বের প্রতি মনোযোগ (যদি নামগত বহুত্ব বা পরিসংখ্যান হয়েও থাকে তবু) তৌহিদের গোপন রহস্য ও আধ্যাত্মিক রহস্য থেকে সে দুরে থাকবে । এ জন্যেই হয়তবা হযরত আদম (আঃ) এর ক্রটির রহস্য ছিল, নামগত বহুত্বের প্রতি মনোযোগ যা হল, আমিত্ব মূলক বৃক্ষের প্রাণ ।

ইরফানী গবেষণা ঃ

জেনে রাখ! উপাসক একজন হওয়া সত্তেও পাঠে বহুবাচন মুলক সর্বনামের প্রয়োগের কারণ স্বরুপ জাহেরী আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

যেমন কেউ বলেন, এখানে উপাসক শরীয়ত সম্মত ধোকার আশ্রায় নিয়েছেন । যার মাধ্যমে মহান প্রভুর দরবারে তার উপাসনা গৃহীত হয় । তাই সে তার ইবাদতকে অন্য সকল সৃষ্টির সহযোগে বিশেষ করে পূর্ণ মানব, আলাহর আওলিয়াগণ [যাদের ইবাদতকে মহান প্রভু গ্রহণ করেন] তাদের সহ মহান প্রভুর পবিত্র ও অনুগ্রহের দরবারে উৎস্বর্গ করবেন । যার ফলে তাদের পাশি–পাশি তারও উপাসনা গৃহীত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । কেননা, অনন্ত দাতার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি শোভা পায় না ।

আরও কেউ কেউ বলেন ঃ যেহেতু শরীয়তে যখন নামাজ পড়ার প্রথম নির্দেশ দেওয়া হয় তখন জামায়াত সহকারেই নামাজ আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছিল । এ কারণেই এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । আমরা ইকামতও আজানের রহস্য আলোচনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কথা বলেছিলাম , যে রহস্য সমূহ আমরা [ইচ্ছা করলে প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী] পরিমান মত অর্জন করতে পারি । আর তা হল , আজান হল পথিকের বাহ্যিক আধিপত্যে ও অন্ত আধিপত্যের শক্তির ঘোষণা। যাতে তার সম্মুখে উপস্থিত হতে পারে এবং তারই সম্মুখে ঐ সকল বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা । তাই যখন পথিক আপন বাহ্যিক আধিপত্য ও অন্তর আধিপত্য শক্তি সমূহকে তারই সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং তার অন্তর [قلب] যে তাদের নেতা সে ইমামতের স্থানে দন্ডায়মান হবে ।

فَقَدْ قامَتِ الصَّلاةُ وَ الْمؤمِنُ وَحْدَهُ جَماعَةَ

আল ওয়াসাইলুশ শীয়া ৫খন্ড ৩৫৭পৃঃ ‘সালাত গ্রন্থ’ সালাতুজ জামায়া অধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায় ২ও ৫ নম্বর হাদীস ।

সুতরাং نعبد و نستعين و اهدنا সবই এই উপস্থিত [শক্তি] সমষ্টির মাধ্যমে মহান বিশুদ্ধ সত্তার (محضر قدس) সম্মুখে উপস্থিত হয় । পুতঃপবিত্র ও নিস্পাপ আহলে বাইতগণ থেকেও বর্ণিত হাদীস ও প্রার্থনা সমূহ যা ইরফানের ঋর্ণাধারাসম , সেখানেও এজাতিয় অর্ধের প্রতি ইঙ্গেত করা হয়েছে ।

আরও একটি বিষয় যা লেখকের দৃষ্টিতে নিপাতিত হয়েছে তাহল পথিক যখন (الحمدلله) এর সমস্ত প্রসংশা ও গুণর্কীতনকারীর সকল প্রসংশা ও গুণর্কীতনকে , তাই সে গুণর্কীতন বর্হিবিশ্ব বা অন্ত র বিশ্বের হোক না কেন সকল প্রসংশাকে পরম বিশুদ্ধ সত্য সত্তার জন্য নির্ধারণ করবে । একই ভাবে একই ভাবে বিষয়টি যোগ্যতা সম্পন্ন মহান নেতা ও পবিত্র অন্তের অধিকারী, আরেফগণের কাছে সুস্পষ্ট যে, অস্তিত্বের পূর্ণ বন্ধনীর (قضيضها تمام دايره وجود) بملكها وَ ملكوتها و قضّها وَ) { } । প্রতিটি অস্তিত্বই , অনুভুতি পাশবিক অনুভুতিসম জীবনের অধিকারী । বরং তারা মানবিক উপলব্ধি মূলক জীবনের অধিকারী । মহান প্রভুর প্রতি তাদের গুণর্কীতন শাসন মূলক ও উপলব্ধি মূলক । যা সমস্ত অস্তিত্বের অর্ন্তসত্তায় [বিশেষ করে মানব শ্রেণীর] পূর্ণ রপে বিদ্যমান তাই তারা পরম বিশুদ্ধ সত্তার দরবারে পরিপূর্ণ সৌন্দয্যে পূর্ণ অবনত কেউ যদি তা ভুলে যায় তার পরম বিশুদ্ধ সত্তার দরবার হবে মাটি। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَ اِنْ شَىْءٍ إلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقهُونَ تَسْبيحَهُمْ এমন কোন অস্তিত্ব নেই যারা গুণকীর্তন ও প্রসংশায় মগ্ন নয়, অথচ তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না।

– সুরা ইসরা ২২ নম্বর আয়াত ।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আরও অন্য কয়েকটি পবিত্র আয়াত ও নিস্পাপ ইমামদের বর্ণনা ,যা ঐশী রহস্যে ভরপুরতা অতিশয় সুস্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত বিষয় । তাই যখন আলাহর প্রতি যাত্রায় প্রথিক যুক্তি ও প্রমাণের পায়ে অথবা, ঈমানী আর্কষর্ণে বা ইরফানী দর্শনে এ বাস্তবতাকে লাভ করবে । তখন সে , যে স্তস্থরেই অবস্থান করুক না কেন, বিষয়টি অবস্থান করবে । অস্তিত্ব জগতের সকল অণু-পরামণু পূর্ণ অনুযোগে মহান প্রভুর উপাসক এবং স্রষ্টাকে অন্বেষণ করছে।

অতএব বহু বচন স্বর্বনামে সে ঘোষণা দিবে, যে সমগ্র অস্তিত্ব তাদের সকল গতি ও গতিহীনতায় মহান বিশুদ্ধ সত্য সত্তার উপাসনায় মগ্ন এবং একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছে ।

টিকা

জেনে রাখ! (وَ إيّاكَ نَسْتَعِين) , (إيّاكَ نَعْبُدُ) এর পূর্বে অবস্থান যা সাধারণ দৃষ্টিতে সাহায্য (استعانت) প্রার্থনা ইবাদতের (عبادت) এর অবস্থান করলে যথাযথ মনে হয়। তাই এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন ঃ (عبادت) , (استعانت) এর পূর্বে অবস্থান নিয়েছে না, (اعانت) এর পূর্বে । কখনও (اعانت) ব্যতীতই (استعانت) হয় । যেহেতু এদুটোই পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত তাই পূর্বে ও পরের অবস্থানে কোন পার্থক্য নেই । যে ভাবে বলা হয়েছে ঃ كما يُقالُ فَقَضَيْتَ اِلَىَّ وَ اَحْسَنْتَ اِلَىَّ فَاَحْسَنْتَ حَقّى قَضَيتَ حَقّى আমার অধিকার প্রদান করলে সুতরাং আমার কল্যাণ করলে, আমার কল্যাণ সাধন করলে সুতরাং আমার অধিকার দান করলে ।

আমার অধিকার প্রদানের পর আমার কল্যাণ অর্জন করেছো, এবং আমার কল্যাণ করেছো অতএব আমার অধিকার প্রদান করেছো , আরো বলা হয়েছে , ইবাদতের শুরুতে সাহায্য প্রার্থনা, না স্বয়ং ইবাদত । সুফী সাধকদের এ জাতিয় বক্তব্যের শীতলতা অস্পষ্ট নয় । হয়তবা বিষয়টি এমন যে,পরম সত্যের প্রতি সাহায্যের গন্ডি আলাহর প্রতি যাত্রায় পথিকের অবস্থান অনুযায়ী ইবাদতের গন্ডির পরে এসেছে। বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ইবাদতে একত্ববাদী ও পরম সত্যের ইবাদতে গন্ডিভুত হওয়া । অনেকে সাহার্য প্রর্থণার ক্ষেত্রে মুশরিক তারা পরম সত্যের সাহায্যে গন্ডিভুত না-ও থাকতে পারে ।

যেমন ভাবে আমরা অনেক মুফাচ্ছিরগণ থেকে বর্ণনা করেছি যে, সাহায্যের গন্ডি অবাস্তব । সুতরাং ইবাদতের গন্ডি এখানে একটি সাধারণ অর্থে নেওয়া হয়েছে, যা প্রথম থেকেই প্রতিটি একত্ববাদীর স্থরে বিদ্যমান । আর সাহায্য প্রার্থনার [প্রকৃত] গন্ডি [হল পরম] সত্য ব্যতীত অন্য সব কিছু সার্বিক ভাবে ত্যাগ করা ।

অবশ্য এখানে [ ] সাহায্য প্রার্থণা বলতে কেবল ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থণাকেই বোঝানো হচ্ছে না । বরং সার্বিক ক্ষেত্রের সাহায্য প্রার্থণা । এ অবস্থান সকল মাধ্যম ও বহুত্ব [كسرت] কে ত্যাগ করা এবং পূর্ণভাবে প্রভুকে গ্রহনেই নিহীত । অন্য কথায় ইবাদতের গন্ডি হল, সত্যাকাঙ্খী , ও সত্যান্বেষী হওয়া এবং [প্রভু ব্যতীত] অন্য সকল কিছুর কামনা বাসনা পুর্ণরুপে ত্যাগ করা । আর সাহায্য প্রার্থণার অর্থ হল সত্যদর্শী ও [প্রভু ভিন্ন] অন্যের দর্শন মুক্ত হওয়া । আরেফগণের স্থর ও পথিকদের আলায় সকল কিছুর কামনা - বাসনার পর অবস্থান করছে ।

আধ্যাত্মিক ফসল ঃ

হে পথিক বান্দা জেনে রাখ! সত্যের ইবাদত, সাহায্যের গন্ডি ও একত্ববাদীদের স্থরও পথিকের পূর্ণ অবস্থান নয়। কেননা, এখানে এমন এক আহ্বান আছে যা, একত্ববাদ ও আধ্যাত্মিক অবস্থানের পরিপন্থি । শুধু তাই নয় বরং উপাসনা, উপাসক ও উপাস্য দর্শন এবং সাহায্য, সাহায্যকারী ও সাহায্য প্রার্থী দর্শন তৌহিদের সাথে অসম অবস্থান করে । তাই যখন পথিক সত্যের আলোকধারায় জ্যোর্তিময় হয়ে ঐ জাতিয় বহুত্ব ধ্বংস এবং দশর্নেরও সমাপ্তি ঘটবে । তবে যারা অদৃশ্যের আর্কষণ থেকে আপনায় প্রত্যার্তন করেছে এবং পতনের পর নব্য অবস্থান অর্জন করেছে, ফলে এপর্যায়ে তাদের বহুত্ব মূলক আবারণ আর নেই । কেননা, মানুষেরা কয়েকটি শ্রেনীতে বিভক্ত ।

প্রথম পর্দায় আবৃত দল ঃ আমাদের মত অসহয়রা প্রকৃতির আঁধারের আবারণে আবৃত ও নিমজ্জিত ।

দ্বিতীয় পথিক শ্রেনী ঃ যারা মহান আলাহর প্রতি যাত্রায় ও বিশুদ্ধ দরবারের দিকে অগ্রসরে মগ্ন ।

তৃতীয় মৌল শ্রেনী ঃ যারা বহুত্বের আবারণ মুক্ত হয়ে পরম সত্যে নিমগ্ন । তবে তারা সৃষ্টির প্রতি অমনোযোগ ও সৃষ্টির অন্তরালে পর্দার আবারণে অবস্থান করছে । এ জাতিয় ব্যক্তিদের (صعق کلی) ও (محو مطلق) অর্জিত হয়েছে ।

চতুর্থ সৃষ্টির প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী দল ঃ তারা পূর্ণত্বের ও পথপ্রদর্শকের প্রতীকসম । যেমনটি ছিলেন , মহান নবীগণ ও তাদের মনোনীত প্রতিনিধিবর্গ (আঃ) । এ জাতিয় ব্যক্তিরা যদিও বহুত্বের মধ্যে অবস্থান করেও সৃষ্টির পথনির্দেশনায় লিপ্ত । তাই বহুত্ব এখন তাদের আবারণ মূলক আধাঁর নয়। বরং এটা তাদের জন্য একটি বারযাখসম অবস্থান ।

অতএব (إِيّاكَ نَعْبُدُ) ও (نَسْتَعِينُ وَ إِيّاكَ) উলেখিত শ্রেনী সমূহের অবস্থানুযায়ী তাদের মধ্যে পার্থক্য বিরাজ করছে । তাই আমাদের মত পর্দাবৃত মানুষদের স্রেফ দাবী ও [বাহ্যিক] রুপ ছাড়া আর কিছুই নেই । সুতরাং আমরা যদি আমাদেও পর্দা সম্পর্কে অবগত হই এবং আমাদের ক্রটি ও অপূর্ণতা সমূহ উপলব্ধি করি। তাহলে আমরা যে পরিমান ক্রটি সম্পর্কে অবগত হব আমাদের ইবাদতও ততটুকু জ্যোর্তিময় হয়ে উঠবে এবং মহান প্রভুর অনুগ্রহের সামিল হব । প্রতিটি পথিকের তার পথ ও যাত্রা পন্থানুযায়ী সে পরম সত্যের সান্নিধ্য লাভ করবে। আর (اصلان) মৌলদের ক্ষেত্রে পরম সত্য ও বাস্ত বতা দর্শন হল বিশুদ্ধ বহুত্ব রুপ দর্শন ও অভ্যাসে পরিণত হবে । আর পূর্ণ মানবগণ হলেন , বিশুদ্ধ সত্য । তাই তাদের সত্যের [আলোক] কিংবা সৃষ্টির [আধাঁর] সম আবারণ নেই ।

জাগ্রত ঈমান ঃ

জেনে রাখ হে প্রিয় !যতক্ষন পর্যন্ত আমরা প্রকৃতি জগতের ভারী আবারণে আবৃত ততক্ষন আমাদের সকল কর্ম ও সময় দুনিয়া গঠন ও তার তৃপ্তি উপভোগেই অতিবাহিত হয় । আর মহান প্রভুর স্মরণ , জিকির, ও চিন্তাভাবনা থেকে আমরা প্রকৃত উদাসীন রয়েছি । তাই আমাদের সমস্ত ইবাদত, জিকির, ও পাঠ হল কৃত্তিম । এখানে আমরা 'আল্ হামদুলিলাহর' প্রসংশাকে, না- পরম সত্য কেন্দ্রিক করতে পারি , না- (نَعْبُد إِيَّاكَ) ও (وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِين) অনুসরে সত্যের পথ চলি । বরং আমরা আমাদের এ সার শুন্য দাবীতে মহান প্রভুর দরবারে ঐশী সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেস্তাগণ, মহান প্রেরিত পুরুষগণ, ও নিস্পাপ প্রতিনিধিদের সম্মুখে অপমানিত ও অপদস্তে নতশিরে অবস্থান করছি । যে ব্যক্তির চাল-চলন ও ভাষ্য সমূহ দুনিয়াদার লোকদেও প্রসংশায় অভ্যাস্ত সে কি ভাবে 'আল্ হামদুলিলাহ' পাঠ করবে ?! অন্যদিকে যে ব্যক্তির অন্তর প্রকৃতির সজ্জায় আর ঐশী ঘ্রান শুন্য এবং সৃষ্টির প্রতি ভরসা করে ও আস্ত াবান, সে কোন ভাষায় (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) এক মাত্র তোমাকেই উপাসনা করি ও একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি (وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِين) উচ্চারণ করবে ?!

অতএব তুমি যদি এ ময়দানের উপযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাক , তাহলে সাহসীকতার বেল্ট কমরে বাঁধ এবং মহান সত্যের ঐশর্য নিয়ে অত্যাধিক স্মৃতি চারণ (تفكّر شدّت تذكّر و) ও গভীর চিন্তা ভাবনা কর। একই সাথে সৃষ্টির অক্ষমতা , অভাব, অপদস্ততা, [মনযোগ সহকারে প্রত্যক্ষ করে] পথিক তার প্রথম স্থরে এ সকল রহস্য ও তত্বসমূহ যা এ রচনার বিভিন্ন প্রসংঙ্গে উলেখ করা হয়েছে তার অন্তরে স্থান করে নেবে / অনুপ্রবেশ করাবে । এ ভাবে তুমি তোমার অন্তরকে প্রভুর স্মরণে জীবিত রাখ যাতে তৌহিদের সুঘ্রান তোমার অন্তর নাসিকায় পৌছায়। ফলে অদৃশ্যের সাহায্যে মারেফাতি মানুষদের নামাজে প্রবেশের পথ পাবে ।

আর যদি এ ময়দানের মানুষ না হও, তবে অন্তত পক্ষে তোমার ত্রুটি সমূহকে নিজের চক্ষু সম্মুখে ফলকে নিবদ্ধ কর এবং তোমার অপদস্ততা, অক্ষমতার, প্রতি মনযোগ দাও । ফলে [প্রভুর] সম্মুখে লজ্জা ও অপমানের ভিত্তিতে দন্ডায়মান হতে সংকল্পবদ্ধ হও । তাই উপাসনার দাবী ত্যাগ কর এবং এ পবিত্র আয়াত যার নিপুণ রহস্য সম্পর্কে তুমি অবগত নও, এ জন্যে পূর্ণ মানবের ভাষ্যে পাঠ কর নতুবা, স্রেফ পাঠের আকারে কুরআন পাঠ কর । অন্তত পক্ষে মিথ্যা দাবী ও মিথ্যা আবেদন করবে না ।

ফিকাহ্গত পদ্ধতি ঃ

অনেক ফকিহ্ পাঠের ক্ষেত্রে এ নব্য উদ্দেশ্যের সংযোজন উদ্ভব যেমন (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) ও (وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِين) কে তারা বৈধ বলে স্বীকৃতি দেননি। তাদের ধারণা হল, কুরআনীয়াত ও কুরআনের মধ্যে অসংগত অবস্থা বিরাজ করছে। কেননা, পাঠের অর্থ হল, অন্যের কথার আবৃতি । এ জাতিয় মতামতের কোন ভিত্তি নেই । কেননা, যেমন ভাবে সম্ভবনা রয়েছে কোন ব্যক্তি নিজের প্রত্যক্ষ ভাষ্যে অন্যের প্রসংশা করবে। ঠিক তেমনী পরক্ষ ভাবে অন্যের ভাষ্যে অন্যের প্রসংশা করতেও পারে । উদাহরণ স্বরুপঃ [বিশ্ব কবি] হাফিজের ভাষ্য দিয়ে কারো প্রসংশা করলাম । তাকে যে আমরা প্রসংশা করলাম এখানে কোন সন্দেহ নেই। আর একই সাথে সত্যায়িত করে যে, আমরা হাফিজের কবিতা পাঠ করেছি । অতএব যদি (العالَمِين إِلْحَمْدُلله رَبِّ) দ্বারা সত্যি সত্যিই সকল প্রসংশা একমাত্র প্রভুর জন্য উদ্ভাবন করি এবং (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) দ্বারা প্রভুর দরবারে আমাদের ত্রুটি মুক্ত উপাসনাকে উপস্থাপন

করি। তাহলে প্রভুর ভাষ্য দিয়েই তাঁর প্রসংশা করাকে যে ভাবে সত্যায়িত করে ঠিক একই ভাবেই প্রভুর ভাষ্য দ্বারাই ত্রুটি মুক্ত ইবাদত করলাম । বরং কেউ যদি ভাষ্যের সৃজন মূল এ উদ্দেশ্য শুন্য করে, তাহলে সেটা হবে সাবধানতা বিরোধী । তাই এ জাতিয় পাঠকে যদি বাতিল নাও ধরি । তবে কেউ যদি পাঠব্য বিষয়ের অর্থ না জানে , প্রয়োজন নেই জানার বরং বাহ্যিক পাঠই (بِمالَها مِنَ الْمعنى) যথেষ্ট ।

আমাদের পবিত্র হাদীস সামগ্রীতে ক্বারীর [অর্থ] উদ্ভাবনার প্রতি ইঙ্গেত করা হয়েছে । যেমনটি আমরা কুদসী হাদীসে দেখতে পাই যে বলেন ঃ أىِ قالض فَإذا . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحيم . الْعَبْدُ فِى صَلاَتِهِ . يَقُولُ . حَمَدَنِى يَقُولُ اللهُ ذَكَرَنِى عَبْدى. وَ اذا قَالَ الحَمْدُلله . . ..

বিহারুল আনওয়ার ৮৯তম খন্ড ২২৬ পৃঃ , কুরআন গ্রন্থ’ ২৯ অধ্যায় তিন নম্বর হাদীস, মুহাজ্জাতুল বেইদাহ ১ম খন্ড ৩৩৮ পৃঃ । আইনুল আখবার আর রেজা, ১ম খন্ড ৩০০ পৃঃ ৫৯ নম্বর হাদীস । ২৮ নম্বর অধ্যায় ৫৯ নম্বর হাদীস ।

যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার পক্ষ থেকে প্রসংশা (حمد) ও নামায়ন (تسميه) উদ্ভাবন না হচ্ছে । (ذَكَرَنِى و حَمَدَنِى) আমাকে স্মরণ বা প্রসংশা করলে অর্থ পূর্ণ হয় না ।

একই ভাবে মি’রাজের একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ وَصَلْتَ,فَسَمَّ بِاسْمِى ألان

যখন [আমার] সান্নিধ্য লাভ করলে, অতঃপর আমার নাম স্মরণ কর ,

– ইলালুশ্ শারাইয়া ৩১৫ পৃঃ । আস্সালাতু মি’রাজ’ এর হাদীস ।

(مالكِ يَوم الدِّينِ) ও (نَعْبُدُ إيّاك) পাঠে সত্য পথ প্রদর্শক ইমামগণের (আঃ) যে অবস্থার সৃষ্টি হত , এবং তাদের কারো কারো এ আয়াতটির পূর্ণবৃত্তি, প্রমাণ করে তারা অর্থের গভির উদ্দেশ্য সৃষ্টি (انشاء) করতেন । এ কাজে স্রেফ পাঠই তাদের লক্ষ্য ছিল না । যেমন ঃ إسمعيلُ يَشهَدُ إنْلا إلهَ إلاَّ الله ইসমাইল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই । এ বাক্যটি ইমাম সাদেক (আঃ) এর বর্ণনানুযায়ী , আপন সন্তানদের কাপনে লেখেন । ওয়াসাইলুশ্ শীয়া , ত্বাহারত গ্রন্থ’ তাকফীন অধ্যায়ের ২৯ অধ্যায় ২ নম্বর হাদীস ।

মারেফাতী মানুষদের নামাজের বিভিন্ন স্থরের তারতম্যের একটি রহস্য হল , তাদের এ পাঠের বিভিন্নতা। যেভাবে আমরা পূর্বে এ জাতিয় বিষয়ের প্রতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঈঙ্গেত করেছি। তাই ঐ অবস্থা কখনও অর্জিত হবে না , যতক্ষণ পর্যন্ত পাঠক পাঠের ও ‘জিকির’ যপের পরিচালক ও প্রতিনিধিত্ব করবে না । এ কথার দলিল ও প্রমাণ এরও অধিক রয়েছে । বিশেষ করে এই অর্থে প্রভুর ভাষ্যে লক্ষ্য [انشاء] সৃষ্টি করায় কোন অসুবিধা নেই ।

প্রতিফল ঃ

অভিধানে ইবাদতের (عبادت) অর্থ করা হয়েছে পূর্ণ বিনয় ও অবনত হওয়া । তাই তারা বলেছেন ইবাদতের শ্রেষ্ঠ স্থর হল বিনয়। সুতরাং যে অস্তিত্বগত পূর্ণতা , কল্যাণ ও সৌন্দয্যের পূর্ণতার অধিকারী নয় সে ইবাদতের যোগ্য নয়। একারণে পরম সত্য ব্যতীত অন্যের ইবাদত হল শিরক্ সমতুল্য। হয়তবা ফার্সি ভাষাতে ইবাদতকে যে (পারাস্তেশ) ও (বান্দেগী) অর্থ করা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে এর অর্থ আরও অনেক গভীর। আর তা হল , মহান প্রভু ও স্রষ্টার সম্মুখে বিনয়ী হওয়া। এজন্যেই এজাতিয় বিনয়ের অনিবার্য শর্ত হল , প্রভুকে উপাস্য স্বরুপ গ্রহণ করা । অথবা এজাতিয়

কোন কিছুকে বা, সাদৃশসম ও অনুরুপ কিছুকে উদাহরণ স্বরুপ , ঐ নীতির উপর ভিত্তি কে মহান সত্য ব্যতীত অন্যের ইবাদত হল শির্ক। তবেঐ জাতিয় বিশ্বাস মুক্ত পূর্ণ বিনয় [যদি বাহ্যিকও হয়] তাই যদি সে বিনয় পরিপূর্ণ রুপও ধারণ করে তবুও শির্ক বা কুফরে পরিগণিত হবে না । যদিও এ জাতিয় বিনয়ে কোন কোন রুপ হারাম হতে পারে যেমন বিনয় প্রদর্শনে কপাল মাটিতে রাখা । এ জাতিয় বিনয় যদিও ইবাদত মূলক নয় তারপরও মর্ব সম্মত ভাবে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে ।

অতএব প্রতিটি মাজহাবের লোকেরা যে তাদের নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে । এই বিশ্বাসে যে, তারা এমন এক বান্দা যারা মহান প্রভুর প্রতি সমস্ত ক্ষেত্রে মুখাপেক্ষী এবং সৎকর্মশীল বান্দা । যদিও তারা নিজের কল্যাণ, অকল্যাণ ,জীবন, মরণের অধিকর্তা নয় তারা ইবাদতের মাধ্যমে মহান প্রভুর দরবারে বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং প্রভুর অনুগ্রহ প্রতিদানের একটি মাধ্যম স্বরুপ। এজাতিয় বিশ্বাসে বিনয় প্রদর্শনে কখনও শিরক্ বা কুফর মিশ্রিত নয় । মহান প্রভুর বিশিষ্টবান্দাদের প্রতি সম্মান, বস্ততঃ প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সমতুল্য, (খোদার বিশিষ্ট বান্দাদের প্রতি প্রীতি, প্রভুর প্রতি প্রীতিসম)।

اشهد بالله و كفى به شهيداً এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রদায়টি মহানবীর জ্ঞানের ভান্ডার, হিকমাত, ও পবিত্রতার আহলে বাইতের বিশেষ অনুগ্রহে অন্য সকল মানব সম্প্রদায় হতে মহান প্রভুর গুণশীতন, পবিত্রতা ঘোষণাও তৌহিদের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা দান করে তারা হল, দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া সম্প্রদায় । যাদের মৌলিক বিশ্বাসের গ্রন্থ যেমন ঃ পবিত্র গ্রন্থ উসুল আল্ ক্বাফী ও পবিত্র গ্রন্থ তৌহিদ (শেইখ সাদুক (রঃ)। তাদের নিস্পাপ ইমামদের প্রার্থনা ও ভাষ্য সমূহ যা তৌহিদ, পরম সত্যের পবিত্রতা ঘোষণা (تقديس و تنزيه) সবই ওহীর ভান্ডার থেকে অবতরন করেছে এ অমিয় ধারা । এ গুলো নিজেই সাক্ষ্য বহন করে যে, এ জাতিয় জ্ঞান মানব সভ্যতায় কখনও প্রচালিত ছিল না , আর পবিত্র ঐশী গ্রন্থ কুরআন শরীফ যা সুমহান শক্তির হাতে রচিত হয়েছে এরপর , তাদের মত করে মহান প্রভুকে (تقديس و تنزيه) পবিত্রতা, ও গুণকীতন ঘোষণা আর কেউই করেনি ।

এতদসত্তেও সমস্ত যুগে শীয়ারা এমন পথ প্রদর্শন নিস্পাপ একত্ববাদী নেতাদের অনুসরণ করেছে এবং তাদের সুস্পষ্ট নির্দেশনায় পরম সত্য সত্য পরিচিতি লাভ করে প্রভুর পবিত্রতা ও তৌহিদের ঘোষণা দিয়ে থাকে । অথচ কোন কোন সম্প্রদায় যাদের বিশ্বস ও গ্রন্থ সমূহ তাদেও কুফরী আকীদার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে । তারা তাদের [শীয়াদের] উপরর তিরস্কার ও অভিসম্পাতের দ্বার উন্মোচিত রেখে , তাদের যে কলুষিত অন্তর তাদ্বারা নিস্পাপ আহলে বাইতের অনুসারীদেরকে শিরক্ ও কুফর-এ অভিযুক্ত করে । এ জাতিয় মন্তব্য মারেফাত ও হিকমতের বাজারে কোন মূল্য নেই । তবে যেহেতু এ জাতিয় অপবাদ, অজ্ঞ, মূর্খ, ও সাধারাণ জনগণকে যারা জ্ঞানের খনি সম্পর্কে বেখবর তাদেরকে আরও অধিক অজ্ঞতা, পঙ্কিলতার পথে ঠেলে দেয় । তাই এটা মানব জাতির জন্য এক অপুরনীয় চরম অত্যাচার । একারণেই বুদ্ধিবৃত্তি ও শরীয়তের মানদন্ডে এই অক্ষম অসহয় মুর্খদের গোনাহ্ সমূহ ঐ বে-ইনসাফ শ্রেনী যারা তাদের আত্ম স্বার্থের কল্পনায়, ইসলামী জ্ঞান ও ঐশী বিধি–বিধানের প্রসরতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল, তাদের উপর পতিত হবে । যাদের কারণে এ সাধারণ জনগণ দূর্ভোগ, ও ব্যর্থতায় পতিত হয়েছে এবং হযরত সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ও ধ্বংস করে দিয়েছে ঐশী ওহীর আহলে বাইতের জ্ঞানের দ্বারকে জনগণের প্রতি রুদ্ধ করে দিয়েছে । হে প্রভু তাদের প্রতি অভিসম্পাত নাযিল কর , চরম অভিসম্পাত, আজাব নাযিল কর চরম আযাব

اللهم العنهم لعنا و عذبهم عذابا أليما

মহান প্রভু বলেন ঃ ... اهدنا الصراط المستقيم

জেনে রাখ! হে প্রিয়, যেহেতু পবিত্র সুরা হামদে, সম্মোহন ও মারেফাতি নেতাদের পথ পরিক্রমার পন্থা বর্ণিত হয়েছে । ایاك نعبد – পর্যন্ত পথ পরিক্রমার সমস্ত পন্থা সৃষ্টি হতে স্রষ্টা অবধি সন্নিবেশিত হয়েছে । তাই যখন পথিক ক্রিয়াবাচক নামের তাজালীর স্থর থেকে গুণবাচক তাজালীর স্থর অতিক্রম করে সত্তাবাচক তাজালীতে উন্নীত হবে । তখন সে আলোক ও আধারাচ্ছান্ন আবারণ মুক্ত হয়ে (مشاهد ہ حضور و) প্রত্যক্ষ ও উপস্থিতির ভিত্তি স্থাপন করবে । অতঃপর পূর্ণ বিলীনত্বে আবস্থান লাভ করবে এবং পরিপূর্ণ বিনাশ সংঘটিত হবে । এভাবে যখন আলাহর প্রতি যাত্রার পরিসমপ্তি ঘটবে, তখন উপাসনার আবাশে অস্তমিত হয়ে مالك يوم الدين) এর আধিপত্যের রাজ্যে উদিত হবে । অতপর এ যাত্রার শেষ প্রান্তে স্থিরতা ও প্রশান্ততা মুলক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং পথিক সজ্ঞেয় হয়ে উঠবে । এ পর্যায়ে (صحو مقام) স্থায়ীত্বের অবস্থান লাভ করবে । তাই সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্যানুযায়ী পরম সত্যেও প্রতি মনযোগ নিবেশ করবে । অন্য কথায় আলাহর প্রতি যাত্রার অবস্থায় সৃষ্টির আবারণে স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করবে । আর এর পরবর্তী অবস্থানে পূর্ণ (فنای کلی) বিলীনত্বের স্থর যা (الدين مالك يوم) এ সংঘটিত হয়ে ছিল তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে পরম সত্যের আলোকে সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করবে । একারণেই (ایاك نعبد) বলবে, (إِيَّا) সর্বনামটিকে প্রথমে অবস্থান দেয়া হয়েছে এবং (كاف) হল তার অপন সত্তা ও ইবাদতের প্রতি সম্মোধন সূচক । আবার যেহেতু এ স্থরে অবস্থার অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে পদস্খলনের সম্ভবনাও রয়েছে , তাই স্থিতিশীলতা ও প্রয়োজনীয় বিষয়দি পরম সত্যের নিকট প্রার্থনা করবে এই ভাষায় যে, আমাদেরকে (إهدنا) পথ প্রদর্শন কর , অর্থাৎ (ألزمنا)আমাদেরকে বাধ্য কর , যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে, উলেখিত অবস্থানটি ও বর্ণিত ব্যাখ্যা পূর্ণ মানব ও মারেফাতী মানুষদের জন্য যা, আলাহ পথে যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের প্রথম অবস্থান, এখানে মহান সত্য সৃষ্টির (আবারণে) তাদের অন্তরাল হবে । আর তাদের পূর্ণতার অবস্থান যেখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টা আবারণী হবে না (যেহেতু আমরাই পরিবৃত) একই ভাবে স্রষ্টাও এখানে সৃষ্টির আবারণ মূলক অবস্থানে থাকবে না । কেননা পরস্পর আগ্রহীদ্বয় তারা আর্কষনে বিলীন । অতএব তাদের (اصلان مشتاق وفانيان مجذوب) হল দ্বিজগতের মধ্যস্থানে মধ্যম বারযাখ যা সত্য পথ ।

অতএব (الذين أنْعَمتَ عَلَيْهِم) এর উদ্দেশ্য হল, তারাই যাদেরকে মহান সত্তা (فيض اقدس) এর তাজালির মাধ্যমে মহান জ্ঞেয় তাদের মেধার ভাগ্যশক্তি অনুপাতে অর্পন করেছেন । অতপর তাদেরকে পূর্ণ বিনাশের পর আপনার রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করান । একই ভাবে এ তফসির অনুযায়ী (مَغْضوبِ عَلَيْهِم) হল, উত্তীর্নের পূর্বে পরিতৃত ব্যক্তিগণ আর (ضالّين) এর অর্থ হল, হযরতে বিনাশ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ।

তবে যারা অপূর্ণ সত্তা, যারা এখনও পথ -যাত্রায় নেমেনি । এ বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে সত্যায়িত হবে না । তাই তাদের পথ হল শরীয়তের বাহ্যিক পথ । এজন্যেই (مستقيم صراط) এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ‘ধর্ম’ ইসলাম, ... ইত্যাদি । আর যদি পথিক হয়ে থাকে , (هدايت) এর অর্থ এ পথপ্রদর্শন এবং (صراط مستقيم) হল আলাহর প্রতি উত্তীর্নের সর্বাধিক নিকটতম পথ । আর এপথ হল আলাহর রাসুল এবং তাঁর আহলে বাইত । যে ভাবে তফসির করা হয়েছে , আলাহর রাসুল সত্য পথ প্রদর্শকগণ ও আমিরুল মুমিনীন । এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে , মহানবী (সঃ) কোন একদিন মাটিতে

একটা সরল ও সোজা দাগ কাটলেন। তারপর তার পাশ দিয়ে বাঁকা বাঁকা দাগ টানলেন । অতঃপর বলেলন ঃ এই মাঝখানের পথটি আমার সোজা সুজি পথ ।

– ইলমুল ইয়াকীন নামক গ্রন্থের ২য়খন্ড ৯৬৭ নম্বর পৃষ্ঠায়ও ঠিক এরকমই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মহান প্রভু যে ‘মধ্যম উম্মত ’ বলে সম্মোধন করেছেন ঃ جَعَلْناكُمْ أُمَّة وَسَطاً

তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি ।

– সুরা বাকারা ১৪৩ নম্বর আয়াত ।

সার্বিক অর্থ ও উক্তির মধ্যমপন্ধী, হবে বিশেষ করে জ্ঞান ও পরিচিতি এবং আত্মিক পূর্ণতার মধ্যমতা যা বৃহৎ বারযাকের অবস্থান আর মধ্যমতা অতি মহান জিনিস । এজন্যেই অবস্থানটি পূর্ণ মানব ও আউলিয়ালাহদের জন্য নির্ধারিত । এ কারনেই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল নিষ্পাপ ইমামগণ (আঃ) । যেমন ভাবে আমরা ইমাম বাকের (আঃ) এর উক্তিতে দেখতে পাই তিনি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আজলীকে বলেন ঃ

الوسطى وَ نَحْنُ شُهَداءُ اللهِ عَلى خَلْقِه قال ابو عبدالله عليه السلام نحنُ الْأُمَّ

আমরাই মধ্যম উম্মত আমরাই সৃষ্টির প্রতি ঐশী দ্রষ্টা ।

– উসুল আল্ ক্বাফী ১মখন্ড ১৯০ পৃঃ। আল হুজ্জাত’ গ্রন্থ (ফি আন্নাল আয়েম্মাতা) অধ্যায় ২ নম্বর হাদীস ।

অন্য আকেরটি হাদীসে বলেনঃ আমাদের প্রতি ‘গলি’ প্রত্যাবর্তন করবে এবং অক্ষমও আমাদের সাথে সংযুক্ত হবে ।

الْمُقَصِّرُ عن ابى جعفر عليه السلام إلينا الغالى وَ بِنا يُلْحَقُ তাফসিরে আইয়াশী ১ম খন্ড ৮২নম্বর পৃঃ ১১১ নম্বর হাদীস ।

এ হাদীসে উলেখিত বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে ।

ইশরাখী টিকা ও ইশরাখী ইরফান ঃ

জেনে রাখ! হে বাস্তবতা ও সত্য সন্ধানী যে, মহান সত্য সত্তা, অস্তিত্বে নিয়ম নীতি এবং অদৃশ্য ও দৃশ্যে প্রকাশকে, হযরত নাম ও গুণের পরিচিতিতে আপন সত্তার প্রতি প্রেমে বলেন ঃ كُنْتُ كَنْزاً الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ مَخْفيّاً فَأَحْبَبْتُ أنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ আসরারুল শারীফা সাতওয়ারুল তারীকা ওয়া সাওয়ারুল হাকীকা, ৪৫ পৃঃ। বিহারুল আনওয়ার ৮৪তম খন্ড ১৯৯ ও ৩৩৯ পৃঃ। আস্সালাত গ্রন্থ ৮১, ৮২ অধ্যায় ১৯৬ নম্বর পৃঃ।

সকল সৃষ্টির সত্তায় সত্তাগত প্রেম সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন । যার মাধ্যমে সে প্রভুর প্রতি আকর্ষণ, প্রতিপালকের প্রতি আগ্নেয় অনুরাগ সার্বিক পূর্ণতা আকাংখার বস্তু ও সর্বসৌন্দয্য মন্ডিতপ্রেমিকের প্রতি আসক্ত করে তোলে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঐশী সত্তাগত নুর প্রবিষ্ট করানো হয়েছে, যে নুর তার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যের সন্ধান দিয়ে থাকে । এই আগুন ও আলো (نور ও نار) একটি রাফরাফে উত্তীণ হয় আরেকটি উধ্বগামী বারাকে । সম্ভবতঃ বারাক ও রাফরাফ (رفرف ও براق) হল রাসুলুলাহ ও তার আহলে বাইত, এরহস্যে সুক্ষ্ম তত্ব এবং এ তত্বের (ملكيّه ও متمثّله) রুপসম । তাই বেহেস্ত যা এ বিশ্বের অন্তরে তা থেকে অবতরণ করেছে ।

যেহেতু সকল অস্তিত্ব মহান রুপও সৌন্দর্যময় প্রেমিক হতে আবারণে অবতরন করেছে । তাই মহান সত্য সত্তা এই আগুন ও আলো (نورওنار) তাদেরকে আধারের রুপের আবারনে ও আমিত্ব মূলক

আলো হতে , পবিত্র নাম (هادى) দ্বারা (যা এ রহস্যের বিশেষ সারমর্ম) মুক্ত করাবেন। যে বিশুদ্ধ লক্ষ্য ও প্রেমিকের সান্নিধ্যের অতি নিকটবর্তী বিশুদ্ধ পথে পৌছে দিবে। অতঃপর ঐ নুর (هدايت) মহান সত্য আর ঐ আগুন (توفيق) প্রভু, ও নিকটবর্তী পথ যাত্রা (صرات مستقيم) হবে । আর ঐ সরল ও সোজা পথের উপর মহান সত্য সত্তা অবস্থান করছে ।

হয়তবা, এ পবিত্র আয়াতটি এই জাতিয় হেদায়েত এ পথ পরিক্রমা ও এ লক্ষ্যের প্রতি নির্দেশ করছে ।

ما من دابَّةٍ إلاّ هُوَ اخِذٌ بناصِيَتِها إنَّ رَبِّى على صِراطٍ مُستَقِيم

– সুরা হুদ ৫৬ নম্বর আয়াত ।

যে বিষয়টি মারেফাতি মানুষের কাছে অতি সুস্পষ্ট ।

অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে, প্রতিটি অস্তিত্বের নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ ও হেদায়েতের আলো করেছে.. . . ।

সৃষ্টির পরিসংখ্যান অনুযায়ী পথ বিদ্যমান, হাদীসটি রাসুল (সঃ) এর বলে কথিত আছে ।

والطُّرُقُ إلى الله بِعَدَد أنفاسِ الْخَلائق জামেউল আসরার ওয়া মানবাউল আনওয়ার ৮, ৯৫, ও ১২১ নম্বর পৃঃ । গুলশানে রাজ গ্রন্থের 'লাহীজির' ব্যাখ্যা ১৫৩ নম্বর পৃঃ। নাকদুস নুসুস ১৮৫ পৃঃ, মিনহাজুল ত্বলিবিন ২২১ পৃঃ আল্ ,উসুল আশারাহ্ ৩১ পৃঃ। মিনহাজুল ত্বলিবিন ২২১ পৃঃ। আল্ উসুল আল্ আশারাহ্ ৩১ পৃঃ ।

এ জন্যে মানুষের পথ সর্বাধিক আধারাচ্ছান্ন ও দীর্ঘ পথ। অন্য দিকে যেহেতু মানুষের প্রতিপালক হল, হযরত মহান নাম আলাহ্ । যে প্রকাশ অপ্রকাশ শুরু এবং সমাপ্ত, দয়ালু ও কঠোর এবং সবশেষে সমস্ত নাম তার পেক্ষাপটে সমভাবে অবস্থান করছে। এ যাত্রা পথের শীর্ষে স্বয়ং মানুষের জন্য বৃহৎ বারযাখের অবস্থান অর্জিত হওয়া উচিত । এ কারণেই মানুষের অন্য সকল পথ হতে সর্বাধিক সুক্ষ্ম ।